তৃণাঙ্কুর

(১৯ জুন, ১৯২৩—জানুয়ারি ১৯৩৯)

বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে, আমার এই দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে মাত্র। কখনো অন্ধকারে, কখনো জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে, কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, গহন পর্বতারণ্যে বা জনকোলাহলমুখর নগরীতে, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মনযেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল—এই সব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেইজন্য বহুস্থলে এইরচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়াছে যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। লিপিকৌশলেরইচ্ছাও ইহাদের মূলে ছিল না—হয়তো দ্রুত ধাবমান রেলের গাড়িতে, কিংবা পথচারী পথিকের স্বল্প অবসরে, পথিপার্শ্বের কোনো বৃক্ষতলে বা শিলাসনে যে সব রচনার উদ্ভব—লেখকমনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ সেখানে কোথায়? যে অবস্থায় যেটিছিল, অপরিবর্তিত ভাবেই সেগুলি ছাপা হইয়াছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতিরঅতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহুহারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে। যে সবঅবস্থার মধ্যে কখনো পড়িব না, ক্ষণকালের জন্য তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া যাইএগুলি পড়িতে পড়িতে—ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বাণীমূর্তি দেওয়ার ইহা একটি বড়সার্থকতা বলিয়া মনে করি। আমার জীবনের ও জগতের বহির্দেশে যাঁহারা অবস্থিত—তাঁহারা এগুলি হইতে কি রস পাইবেন আমি জানি না, তবে একথা অনস্বীকার্য যে কৌতুক বা কৌতূহলের মধ্য দিয়া একটি নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি জীবনের সকলদর্শকের পক্ষেই স্বাভাবিক— কারণ, ইহার মূলে রহিয়াছে মানবমনের মূলগত ঐক্য।

লেখক

এক মাস পরে আজ আবার কলকাতায় ফিরেচি। এই এক মাস দেশে কাটিয়েচি অনেককাল পরে। মা মারা যাওয়ার পরে আর এত দীর্ঘদিন দেশে কখনো থাকিনি। এই এক মাস আমার জীবনের এক অপূর্ব অধ্যায়। Dean Inge যাকে ঠিক Joy of Life বলেচেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। সেরকমনিভৃত, শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালো জল নদীতীর না হলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে? শহরের কর্মকোলাহলে ও লোকের ভিড়ে তার সন্ধান কোথায় মিলবে? তাই যখন জটাখালির ভাঙা কাঠের পুলটাতে দুধারের মজা গাঙ ওবাঁওড় এবং মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, নীচে ঘনসবুজ গাছপালা, ধানক্ষেত, বিল, গ্রামসীমার বাঁশবন, মাটির পথের ধারে পুষ্পভারনত বাবলা গাছের সারি, দূরের বটের ডালে বৌ কথা-ক' পাখির ডাক—এসবের মধ্যে প্রতি বৈকালে গিয়ে বসতাম, তখন মনে হতআর শহরে ফিরে যাবার আবশ্যক নেই। জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছেজীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবারআনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্যকে উপভোগ করায়।সেকথা বুঝেছিলাম সেদিন, তাই সন্ধ্যার কিছু আগে জীবনের এই অনন্ত গতি-পথেরকথা ভাবতে ভাবতে অপূর্ব জীবনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাহ্য না করেই কুঠির মাঠের অন্ধকার, ঘন নির্জন ও শ্বাপদসঙ্কুল পথটা দিয়ে একা বাড়ি ফিরলাম। আর নদীর ধারে অপূর্ব আকাশের রং লক্ষ্য করে তার পরদিনও ঠিক সেই মনের ভাব আবার অনুভব করেছিলাম।

এরকম এক একটা সময় আসে, যখন বিদ্যুৎচমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তাএকবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্তেজানতে পারা যায়, বুঝতে পারা যায়। শুধু সৌন্দর্যই এই

বিদ্যুৎ—আলোর কাজ করেমানসিক জীবনে। কিন্তু এই সৌন্দর্য বড় আপেক্ষিক বস্তু। একে সকলে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না। কানকে, চোখকে, মনকে তৈরী করতে হয়, সঙ্গীতের কানের মত সৌন্দর্যের জ্ঞান বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে। শিমুলগাছের মাথাটার উপরকারআকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতিডাঙ্গার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই রক্ত-মেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্বতশিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে—তার ওপারে যেন জীবন-পারের বেলাভূমি! আনন্দ আবছায়ার মত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার একটু একটুচোখে পড়ে।

রোজ আমাদের বাড়ির পাশের বাঁশতলার পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাল্যের শত ঘটনা, কল্পনার আশা, দুঃখ-সুখের স্মৃতি মনে জেগে উঠত—এই সব বনের প্রতি গাছপালায়, পথের প্রতি ধূলিকণায় যে পঁচিশ বৎসর আগের এক গ্রাম্য বালকের সহস্রসুখ-দুঃখ জড়ানো আছে, কেউ তা জানবে না। আর এক শত বৎসর পরে তারইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে? কোথায় লেখা থাকবে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরেরবালক জীবনে প্রথম গ্রামের উত্তরমাঠে তার জেঠামশায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিল? কোথায় লেখা থাকবে তার মায়ের-হাতে-ভাজা তালের পিঠে খাওয়ার সে আনন্দের কাহিনী? সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘাটে স্নান করতে নেমেনতুন-ওঠা চতুর্থীর চাঁদের দিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে এইসব কথা বেশি করেমনে জাগছিল। গোপালনগরের বারোয়ারীর যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়লো যে আজ পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দাতেবসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

সে-সব কথা যাক। অদ্ভুত এই জীবন, অপূর্ব এই সৃষ্টির আনন্দ। নির্জনে বসে ভেবে দেখো, মানুষ হয়ে উঠবে।

অনেককাল পরে গরীবপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে খিনু ও তার বোন রাণীর সঙ্গেদেখা হল। আজ প্রায় ষোল বছর আগে ওদের বাসাতে বাড়ির ছেলের মত থাকতুম। তখন আমিও বালক, ওরা নিতান্ত শিশু। সেই খিনুকে যেন আর চিনতে পারা যায় না। এত বড় হয়ে উঠেচে, এত দেখতে সুন্দর হয়েচে। রাণীও তাই। কতক্ষণ তারা আমাকে কাছে বসিয়ে পুরনো দিনের গল্প করতে লাগলো আপনার বোনেদের মত, ছাড়তে আরকিছুতে চায় না। শেষকালে রাণী তার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা দিয়ে কলকাতায় গেলেইযেন সে ঠিকানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, এ অনুরোধ বার বার করলে।

এবার আরও সকলের চেয়ে ভাল লেগেচে যেদিন রামপদর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মোল্লাহাটি ছাড়িয়ে পাঁচপোতায় বাঁওড়ের মুখে গিয়েছিলুম। এক তালীবনশ্যাম গ্রামরাজি।আকাশের কি নীল রং, ইছামতীর কি কালো জল। নৌকাতে আসবার সময় জ্যোৎস্নারাত্রেনির্জন কাশবনের ও জলের ধারের বন্যেবুড়ো গাছের ও মাথার উপরকার নক্ষত্রবিরলআকাশের কি অসীম সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত।

এই আনন্দ দিনের ইতিহাস পাছে ভুলে যাই, তাই লিখে রেখে দিলুম। অনেককালপরে খাতাখানা খুলে দেখতে দেখতে এইসব আনন্দের কাহিনী মনে পড়বে তাই।

একটা কথা আজকাল নির্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া, আকাশ বাতাসেরমধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধবলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই অপূর্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অণু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনারঅতীত এক জটিলতায় আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না। হঠাৎ বোঝা যায় না, কিন্তুকতকগুলি প্রাথমিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে অগ্রসর হ'লে আপনা-আপনি গভীর চিন্তারমুখে ধরা দেয়। এক্ষেত্রে একটা ভুল গোড়া থেকে অনেকে করেন। সেটা এই যে, পূর্বেরজ্ঞান মনের মধ্যে এসে পৌঁছলে অনেকে জ্ঞানের চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে বলেনজগৎ মিথ্যা ও মায়াময়।

বেদান্তের পারিভাষিক 'মায়া' ছাড়াও আর একটা লৌকিক বিশ্বাসের 'মায়া' আছে, যেটাকে ইংরেজীতে illusion বলে অনুবাদ করা চলবে। বেদান্তের মায়া illusion নয়, সে একটা দার্শনিক পরিভাষা মাত্র, তার অর্থ স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা লৌকিক অর্থে 'মায়া' শব্দটা গ্রহণ করেন ও অর্থগত তত্ত্বটি মনে মনে বিশ্বাস করে হৃষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁরাভুলে যান মানুষও তো এই অসীম রহস্যভরা সৃষ্টির অন্তর্গত। তাঁর নিজের মধ্যে যেআরও অনেক বেশি সম্ভাব্যতা, অনেক বেশি আধ্যাত্মিকতা, অনেক বেশি জটিলতা, আরও বেশি রহস্য। নিজেকে দীন বলে 'মায়া' কর্তৃক প্রতারিত দুর্বল জীব মনে করারমধ্যে যে কোনো সত্য নেই, এটা সাহস করে এঁরা মেনে নিতে পারেন না।

নীরদদের বাড়ি কাল সন্ধ্যার সময় বসে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলুম একখানা ইংরেজী পত্রিকাতে। এই কথাইশুধুমনে হল আমরা জীবনে একটা এমন জিনিস পেয়েচি, যাআমাদের এক মুহূর্তে সাংসারিক শান্তিদ্বন্দ্বের ওপরে এক শাশ্বত আনন্দ-জীবনের স্তরে উঠিয়ে দিতে পারে—অনন্তমুখী চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে দেয়, এক মুহূর্তে সংসারেররং বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। যখনই জগতের প্রকৃত রূপটির যে অংশটুকুআমরা চোখে দেখতে দেখতে যাই তা সমগ্রতার দিক থেকে আমরা দেখতে যাই, পরিপূর্ণ ভাবেজীবনকে আস্বাদ করবার চেষ্টা করি—ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, আকাশ, নীহারিকা, নক্ষত্র, অমরত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য, পদার্থতত্ত্ব, ফুলফল, গাছপালা, অপরাহ্ণ, জ্যোৎস্না, ছোটছেলেমেয়ে, প্রেম—তখনই বুঝি এই বিশ্বের সকল সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে একত্ব অনুভবকরা ও চারিধারে আত্মাকে প্রসারিত করে দেওয়াই জীবনের বড় আনন্দ। 'আনন্দ' উপনিষদের পারিভাষিক শব্দ, লঘু অর্থে সংসারে চলে এসেচে কিন্তু আনন্দ কথারপ্রকৃত অর্থ উচ্চ জীবনানন্দ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে" এখানেআনন্দের কোনো বর্তমান প্রচলিত সাধারণ অর্থ নেই।

আজ খুব বেড়ানো হল। প্রথমে গেলুম বন্ধুর ওখানে। তার মোটরে সে প্রবাসীঅফিসে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সেখান থেকে গেলুম সায়েন্স কলেজে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডাঃ রায় এলেন। তিনি সিন্ডিকেটের মিটিং-এ গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তার পর দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল, একেবারে সোজা সারকুলাররোড্ দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে প্রিন্সেপ্ ঘাট। বেশ আকাশের রংটা, ক'দিন বৃষ্টির জ্বালায়অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, গঙ্গার ওপারে রামকৃষ্ণপুর, ময়দাকলগুলোর ওপরকার আকাশটা তুঁতে রং-এর, পশ্চিম আকাশে কিন্তু অস্তসূর্যেররং ফোটেনি—কেন তা জানি না। ডাঃ রায়ের সঙ্গে বর্তমান কালের তরুণ সাহিত্যসম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হল—তাঁর মত ভারী পাকা ও যুক্তিপূর্ণ। সকালে সকালেফিরলাম, তিনি আবার বৌবাজারের দোকানটা থেকে খাবার কিনলেন। আমায় বললেন, মাঝে মাঝে দেখা করবার জন্যে।

জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করি, তবে সে এই ডাঃ পি. সি. রায়কে। সত্যিকারমহাপুরুষ। বহু সৌভাগ্যে তবে দর্শনলাভ ঘটে, একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।অধিকক্ষণ কথাবার্তা কইবার পরে মনে হয় যে সত্যিই কিছু নিয়ে ফিরচি।

আজ প্রবাসীতে গিয়ে [1]বইটার প্রথম ফর্মাটা ছাপা হয়েচে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারেপড়া হবে। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু কাল থাকবেন বলেচেন।

সেখান থেকে গেলুম দক্ষিণাবাবুর গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণে কালীঘাটে। সুরেশানন্দেরছোট একবছরের খোকাটি কি সুন্দর হয়েচে। ওকে কোলে নিয়ে চাঁদ দেখালুম—ভারী তৃপ্তি হল তাতে। এরা সব কোথা থেকে আসে? কোন্ মহান্ আর্টিস্টের সৃষ্টি এরা? অনন্ত আকাশে কালপুরুষের জ্যোতির্ময় অনল জ্বলতে দেখেচি, পূর্ব দিক্‌পালের আগুনঅক্ষরে সঙ্কেত দেখেচি, কিন্তু সে রুদ্র বিরাটতার পিছনে এই সব সুকুমার শিল্প কোথায়লুকানো থাকে? কি হাসি দেখলুম ওর মুখে! কি তুলতুলে গাল! ...

---

[1]পথের পাঁচালী

একটা উপমা মনে আসচে। আমাদের দেশের বারোয়ারীর আসরে কে যেন রবিবাবুর মুক্তধারা থেকে 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র' ওই গানটি আবৃত্তি করচেন। ওর ধ্বনির সঙ্গে ভাবের অপূর্ব যোগ, ওর মধ্যে যে অদ্ভুত ক্ষমতা ও চাতুর্য প্রমাণ পেয়েচে, তা কে বুঝচে? কিন্তু হয়তো এক কোণে এক নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসে আছেন—আসর-ভরা দোকানদার দলের মধ্যে তিনিই একমাত্র নীরব রসগ্রাহী, কবির ক্ষমতাবুঝচেন তিনি। চোখ তাঁর জলে ভাসচে, বুক দুলে উঠচে।

বিশ্ব-সৃষ্টির এই অসীম চাতুর্য, এই বিরাট শিল্প-কৌশল, এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য—ক'জন বুঝবে? দোকানদার দলের মত হাততালি দিচ্ছে হয়তো সবাই। কিন্তু কে মনদিয়েচে ওদিকে—কে ভাবচে এই অপূর্ব, অবাচ্য, অভাবনীয়, অদ্ভুত সৃষ্টির কথা! ...মানুষেরঅভিধানে যাকে বর্ণনা করবার শব্দ নেই।

এক-আধজন এখানে ওখানে। Sir Oliver Lodge, Flammarion, Jeans, Swinburne, রবীন্দ্রনাথ,এঁদের নাম করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "এদের ফাৎনাতেঠোক্‌রাচ্চে"। আনন্দ! আনন্দ!

"আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে"

কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হোল। ডাঃ কালিদাস নাগও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগকরলেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিকবুঝতে না পেরে ভুল করেন, দেখে ভারী আনন্দ হলসজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টেরধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে।

আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশি।

এবার বাড়ি গিয়ে গত শনিবারে অনেকদিন পরে কি আনন্দই পেলুম। মটর লতা, কাঠবেড়ালী, নাটাফুল—বর্ষাসরস লতাপাতার ভরা সুগন্ধ। কাল প্রবাসী থেকে গিরীনবাবুরবাড়ি, সেখান থেকে বিন্ সাহেবের কাছে অনেকদিন পরে। বেশ দিনটি কাটলো। বিভূতির সঙ্গেও দেখা।

আজ সকালে উঠে অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই কীর্তনের গানটা মনে পড়ল "...যাত রহি" শেষ দুটো কথা ছাড়া আর আমার কিছু মনে নাই, অথচ গানেরভাবটা আমি জানি। ভারী আনন্দ হল আজ মনে। শুধুই মনে হচ্ছিল জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখতে শিখিনে বলেই যত গোল বাধে। জীবন আত্মার একটাবিচিত্র, অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্রহবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।

সেইদিক থেকে দেখলে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ, দৈন্য বড় সম্পদ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবনশুধুধনে মানে সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখেসম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্যের, বিলাসেরমেলা—যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র দুধ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ-ধনসম্পদ-ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।

এক-এক সময় মনটা এমন একটা স্তরে নেমে আসে, যখন জীবনের আসল দিকটাবড় চোখে পড়ে যায়; আজ অনেকদিন পরে একটা সেই ধরনের শুভদিন। কলকাতারশহরে এ দিন আসে না।

আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্মাটি ছাপাহোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি—কত ভাবনা, কত রাত-জাগা, সংশোধনের ও পরিবর্তনের ও প্রুফ

দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী অফিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম।ঠিক দু-মাস লাগলো ছাপতে।

ঘনবর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তুসেসব কথা এখানে আর তুলবো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে বসে বনাতমোড়া সেইটেবিলটাতে সেই সব লেখা—সেই কার্তিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়িটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তাশ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে-সব ছবি—সবারই আজ পরিসমাপ্তিঘটল।

উঃ, গত ছ'মাস কি খাটুনিটাই গিয়েচে। জীবনে কখনও বোধহয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটাপর্যন্ত কাটিয়েচি। মাথা ঘুরে উঠেচে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে কেয়াঝোপে বসে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লালফুল-ফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচেসকলের চেয়ে খাটুনি। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বই-এর শেষ ফর্মার প্রুফ ও কাটাকুটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারককরে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, গা-হাত-পা যেন কামড়াচ্ছে।

যাক্। বই বেরুবে বুধবার। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি, তা যেদিইনি, তিনি অন্তত সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কিনা জানি না, আমার কাজআমি করেচি; (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরনো কলমটা দিয়ে, —যেটাদিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষদিকটাতে পার্কার ফাউন্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজমহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যেররঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূরজীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখি-ডাকা, তেলাকুচাফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে এই কথাটিশুধুজানাতে চাই—

ভুলিনি। ভুলিনি। যেখানেই থাকি ভুলিনি..তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুরসংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙীন হয়েচে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়। কেউ বেঁচে আছে, কেউবা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সকলের ব্যর্থতা, বেদনা আমাকেপ্রেরণা দিয়েচে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে রাত্রে,—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানিনে। কোথায় পাবো ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাবো আজ

হিরুকাকাকে, কোথায় পাবো কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্চি।

যারা হয়ত আমার ছাপা-বই দেখলে খুশী হত, তারাও অনেকে আজ বেঁচেনেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তাজানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হৌক, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায়নি আজ রাত্রে।

আজই সকালে দেশ থেকে এলুম। কাল বৈকালে গিয়েছিলুম বারাকপুরে। সইমারবড় অসুখ। ষষ্ঠীর হাট বাজার, জেলি গোপালনগর থেকে নিয়ে এল ঘি, ময়দা, নগেন খুড়ো সপরিবারে ওখানেই।

কি সুন্দর বৈকাল দেখলুম! সে আনন্দের কথা আর জানাতে পারি নে—ঝোপেঝোপে—নীল অপরাজিতা, সুগন্ধ নাটাকাঁটার ফুল, লেজ-ঝোলা হলুদডানা পাখিটা—অস্তসূর্যের রাঙা আভা, নীল আকাশ, মুক্তির আনন্দ, কল্পনা, খুশী।

আজ এখন সুট্‌কেস গোছাচ্চি। এই মাত্র আমি ও উপেনবাবু টিকিট করে এলুম, আজ রাত্রের ট্রেনে যাবো দেওঘর। কাল আবার সপ্তমী। ওখান থেকে হাজারিবাগযাবার ইচ্ছে আছে, দেখি কি হয়।

সেই "রাতের ঘুম ফেলনু মুছে" গানটা মনে পড়ে। সেই অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এ, ১৯১৮ সালে। আজ শ্যামাচরণদাদাদের "মাধবী কঙ্কণ" বইখানা এনেচি। সেই কতকালআগেকার সৌন্দর্য, সেই পুজোর পর বাবার সঙ্গে ম্যালেরিয়া নিয়ে প্রথম বাড়ি যাওয়া,—সেই দিদিমা।

সে সব অপূর্ব স্বপ্ন-ভরা দিনগুলি! জীবনটা যে কি অদ্ভুত, অপূর্ব—তা যারা নাভেবে দেখে তারা কি করে বুঝবে! ...কি করে তারা বুঝবে কি মহৎ দান এটাভগবানের!

সকালে আমরা মোটরে করে বা'র হলুম—আমি, উপেনবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু।ঝরণার কি সুমিষ্ট জল।...একটু একটু বৃষ্টি হল। কিন্তু পথের দুধারে কি অপূর্ব গাছপালা, লতাপাতা, শালচারা, ঝরণা, বাঁশবন—দুধারের ঘন জঙ্গলে জংলা মেয়েরা কাঠ কাটচে—কি সুন্দর মেঘের ছায়া—ত্রিকূটের দু-এক স্থান থেকে নীচের দৃশ্য বড় মনোরম। একস্থানেবাঁশের ছায়ায় বসে ডায়েরী রাখলুম। বড় সুন্দর দৃশ্য!

অর্ধেকটা উঠে বড় পরিশ্রম হল বলে—সকলে উপরে উঠতে চাইলেন না। "অয়ি কুহকিনী লীলে—কে তোমারে আবরিল।" দিব্য শালবনের ছায়ায় বসে—ডায়েরীরাখলুম। আবার মনে পড়েবাড়ির কথা।

আজ বিজয়া দশমী। আকাশও বেশ পরিষ্কার। সকালের দিকে আমরা সকলেমোটরে বার হয়ে প্রথমে গেলুম পূর্ণবাবুর বাড়ি। সেখানে আজ ওবেলা কীর্তন হবে, পূর্ণবাবু আসবার নিমন্ত্রণ করলেন। সেখান থেকে বিমানবাবুর বাড়ি। আমি ও করুণাবাবুমোটরে বসে রইলুম—অমরবাবু ও উপেনবাবু নেমে গেলেন। সেখান থেকে কর্ণীবাগেফকিরবাবুর ওখানে যাওয়া গেল। একটু দূরে মাটির মধ্যে তপোবনের পাহাড়টা চোখে পড়ল। কালকার বালানন্দ স্বামীর আশ্রমটাও পাশেই পড়লো দেখলুম। আজ কিন্তু সেখানে লোকের ভিড় ছিল না—কতকগুলি এদেশী স্ত্রীলোক রঙীন কাপড় পরেদাঁড়িয়েছিল দেখলুম। সেখান থেকে করুণাবাবুর বাড়ি হয়ে এক ব্যারিস্টারের বাড়িতেঅমরবাবুর কি কাজ ছিল তা সেরে যাওয়া গেল দুর্গামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে। দুর্গাপ্রতিমা ভারী সুন্দর করেচে—অমন সুন্দর প্রতিমার মুখ অনেকদিন দেখি নাই।

তারপর বাঙ্গালীদের পূজামণ্ডপে এসে খানিকক্ষণ থাকতেই তারা খেতে বললে। কিন্তু আমি তখন স্নান করি নাই। কাজেই আমার হল না।

বৈকালে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। এত সুন্দর স্থান আমি খুব বেশী দেখি নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। পাহাড়ের উপর গাছপালা বেশী নাই, বন্য আতাগাছইবেশি। কিন্তু পিছনে ধূসর ত্রিকূট পাহাড়ের দৃশ্য ও

সম্মুখে অস্তরাগ-রক্ত আকাশেরতলে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের শান্ত মূর্তি বাস্তবিকই মনে এক অদ্ভুত ভাব আনে। দূরে দূরেশাল মহুয়া বন, শুধু উঁচু-নীচু ভূমি ও বড় বড় পাথর এখানে ওখানে পড়ে আছে।অনেকে পাহাড়ের ওপর বেড়াতে এসেচেন। এত সুন্দর হাওয়া—একথায় মনে হলবাল্যকালে মডেল ভগিনী বইয়ে এই নন্দন পাহাড়ের হাওয়ার কথা পড়েছিলুম—চারিধারে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে বসে ডিগরিয়া পাহাড়ের আড়ালে অস্তমান সূর্যেরদিকে চোখ রেখে কত কথাই মনে আসছিল। উপেনবাবুর ও দ্বিজেনবাবুর অবিশ্রান্তবকুনির দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ মনে হল আজ আমাদের গ্রামেও বিজয়া দশমী। সারা বাংলাতে আজএইসময়টিতে কত নদীতে কত বাচ্ খেলার উৎসব, কত হাসিমুখ। আমাদের গ্রামেরবাঁওড়ের ধারেও এতক্ষণ বিজয়ার আড়ং চলচে—এতক্ষণ বাদা ময়রা তেলেভাজাজিলিপি বিক্রী করচে—সবাই নতুন কাপড় পরে সেজে এসে বাঁওড়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর দেখবার জন্যে। ছেলেবেলার মত বাঁওড়ে বাচ হচ্চে। মনে পড়ে অত্যন্ত শৈশবের সেই শালুক ফুল তোলা, তারপরে বড় হয়ে একদিনের সেই বন্ধুর কাছে চার পয়সা ও মুড়কির কাহিনীটা।

ফিরে আসতে আসতে মনে হল এতক্ষণ আমাদের দেশে পথে পথে নদীর ধারেপ্রিয় পাড়াগাঁয়ের সুপরিচিত ভাঁট-শেওড়ার বনে অপরাহ্ণের ছায়া ঘনিয়ে এসেচে, সেইকটুতিক্ত অপূর্ব সুঘ্রাণ উঠচে—সেই পাখির ডাক—এখানকার মত দূরপ্রসারী উচ্চাবচপাথুরে জমি ও শাল মহুয়া পলাশের বন সেখানে নেই, এরকম পাহাড় নেই স্বীকারকরি, কিন্তু সে-সব অপূর্ব মধুর আরামই বা এখানে কোথায়?মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে এই সময়েই শৈশবের সেই "মাধবী কঙ্কণ" ও "জীবন প্রভাত"—সেই পাকাটির আঁটিও ছিরে-পুকুর। বইখানা শ্যামাচরণদাদার কাছে চেয়ে নিয়ে এলুম। সে-সব দিনের অপূর্বমধুর স্মৃতি—সারাজীবন অদৃশ্য ধূপবাসের মত ঘিরেই রইল। এই নিয়েই তো জীবন— এই চিন্তাতে, এই স্মৃতিতে, এই যোগে। এই মনন ও ধ্যান ভিন্ন উচ্চ জীবনানন্দ লাভকরবার কোনো উপায় নেই। এ আমার জীবনের পরীক্ষিত সত্য।

নন্দন পাহাড় থেকে ফিরে এসে দেখলুম অমরবাবুর বাংলোতে বিজয়ার সম্মিলনীবসেচে। গোল চাতালটাতে জ্যোৎস্নার আলোতে চেয়ার পেতে বিমানবাবু, রবিবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু সবাই বসে আছেন। ঁবিজয়ার আলিঙ্গন ও কুশলাদির আদান-প্রদানের পরে চা ও খাবার খাওয়া হল। একটু পরে ফকিরবাবু এলেন। অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্যিক আলোচনা চলল। আমি ও বিমানবাবুর জামাতা রবিবাবু অনেকক্ষণ ধরে টলস্টয় ও রুশীয় সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। রবিবাবু আমার "পথের পাঁচালী"র প্রশংসা করছিলেন। বললেন, অনেকে বলেচেন, 'পথের পাচালী' শেষ হলে বিচিত্রা ছেড়ে দেবো। আমি ও করুণাবাবু ঘরের মধ্যে এসে বসে সিগারেট খেলুম ওফকিরবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের ঝাল ঝাড়তে শুরু করলুম। তারপরে এক পশলা বৃষ্টিহয়ে সেটা একটু কমে গেল—বিমানবাবু ও রবিবাবু চলে গেলেন—আমরাও পূর্ণবাবুরবাড়িতে কীর্তন শুনতে গেলুম। দক্ষিণা ঘোষ বলে একজন ভদ্রলোক সেখানে বৈষ্ণবভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলছিলেন—আমার বেশ লাগল। খুব জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে জোরে মোটর হাঁকিয়ে অনেক রাত্রে বাংলোতে ফেরা গেল। বেশ লাগছিল।

কাল সকালে সম্ভবত গিরিডি হয়ে ঐ পথে মোটর-বাসে হাজারীবাগ ও সেখান থেকে রাঁচী হয়ে কলকাতায় ফিরবো। দেখি কি হয়। আকাশ পরিষ্কার না থাকলেকোথাও যাবো না।

অমরবাবুর দৌহিত্র অমিতের কথাগুলি ভারী মিষ্টি। তিন বৎসরের শিশু। বেশলাগে ওকে।

এইমাত্র সন্ধ্যা ছ'টার দিল্লী এক্সপ্রেসে দেওঘর থেকে ফিরে এলুম। সারা দিনটাকাটল বেশ। বড় রোদ ছিল। করুণাবাবু সারা পথ কেবল গানের বই বার করেন আরআমাকে এটা ওটা গাইতে বলেন—করুণাবাবু সম্পূর্ণ বেসুরে গাইতে থাকেন। মধুপুরে আমার নেমে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু উপেনবাবু নামলেন

না বলে আমিও আর নামলুম না। তাতে আমার মন খারাপ ছিল, সেটা দূর করে দেওয়ারজন্যে আমার মুখের সামনে একটা সিগারেট ধরলেন।

তারপরে আবার চললো তার সেই বেসুরে গজল গাওয়া। শিশিরকুমার ঘোষের বড় ছেলেও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন—বেশ লোক। হুগলী ব্রিজ থেকে সবাই ঝুঁকে পড়েদেখতে লাগল—আমার মনে হল সেই এক ফাল্গুন দিনে চুঁচুড়ায় শখের থিয়েটার ওগোলাপ ফুলের কথা। সেই দুপুরের ঝম্-ঝম্ রোদে ফাল্গুনের অলস অবশ হাওয়ায় এই স্টেশনের সে প্ল্যাট্‌ফর্মে পায়চারীর কথা কি কখনো ভুলবো।

মধ্যে আবার খুব বৃষ্টি এল। কলকাতায় কিন্তু একটু একটু মাত্র। উপেনবাবুবললেন, আমার অনুচরগণ হেরে গিয়েচে।

এইমাত্র মেসের বারান্দাতে নির্জনে জ্যোৎস্নার আলোতে বসে আছি। বেশ লাগচে। মন মুক্ত, কারণ সম্মুখে প্রচুর অবসর।

এরই মধ্যে দেওঘর যেন দূর হয়ে পড়েচে। আজই সকালে উঠে যে সূর্যোদয়েরপূর্বে আমি দেওঘরের পথে পথে বেড়িয়ে বেড়িয়েচি, তা কি স্বপ্ন?আজই তো ভোরেপশ্চিম আকাশে ধূসর ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের রহস্য-ভরা মূর্তি ও ত্রিকূটের পিছনেরআকাশের অরুণচ্ছটারক্ত সৌন্দর্য দেখেচি, তা যেন মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

করুণাবাবুকে বড় ভাল লাগল। কি শান্ত, সরল হাস্যপ্রিয়, সরস স্বভাবের যুবক!... গান গলায় নেই, তবু অনবরত গান গাইতে গাইতে জোরে চেঁচাতে চেঁচাতে এলেন—সকলে মুচকি হাসচে—গোপনে চোখ ইশারা করচে পরস্পরে, তাঁর দৃক্‌পাতও নেই। তিনি তা বুঝতেও পারচেন না। আপন মনে গান গেয়েই চলেচেন আর আমাকে ডেকে ডেকে বলচেন—আসুন বিভূতিবাবু, এইটে ধরা যাক, আসুন—আমার সুর তাঁর গলার বেসুরাতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দৃক্‌পাতও নেই, সুর-বেসুর সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই। শিশুর মত সরল ভদ্রলোক।

'Men such as these are the salt of the Earth'.

পরশু থেকে কি বিশ্রী বাদলা যে চলচে! কাল গেল কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজার দিনটা—কিন্তু সারাদিন কি ভয়ানক বর্ষা আর নিরানন্দের মধ্যে দিয়েই কাটলো। আজও সকাল থেকেশুরুহয়েচে—কাল সারারাতের মধ্যে তো একদণ্ড বিরাম ছিল না বৃষ্টির। কার্তিক মাসে এরকম বাদলা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। এসব সময়ের সঙ্গে তোবাদলার association মনে নেই—তাই অদ্ভুত মনে হয়। অন্ধকার হয়ে এসেচে—টেবিলে বসে কিছু দেখতে পাচ্চি নে, মনে হচ্চে আলো জ্বালতে হবে। কাল যখনগিরিজাবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছিলুম তখন কেবল ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটু ধরেছিল।রেঙ্গুন যাওয়ার কথা উমেশবাবু যা লিখে রেখে গিয়েচেন, তা এ বৃষ্টিতে কি করে হয়?আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও গিয়ে সুখ নেই।

কাল রাত্রে গিয়েছিলুম শিমুলতলা। সেখান থেকে আজ সকালের ট্রেনে বার হয়েএখানে এসে সন্ধ্যায় পৌঁছানো গেল। ঠিক সন্ধ্যায় গঙ্গার পুলটি পার হবার সময় এই শান্ত হেমন্ত-সন্ধ্যার সঙ্গে কত কথা জড়ানো আছে, যেন মনে পড়ে। সেই হুগলী ঘোলঘাট স্টেশন, সেই কেওটা, সেই হালিসহর, সেই হুগলী—বহুদূরের বাড়ির সে শান্তঅপরাহ্ণ। যেখানে পথের ধারে শ্যামাচরণদাদারা কাঠ কাটিয়েচে, শৈশবের মত সেইকাঠের গুঁড়োগুলো এখনও পথের ধারে যেন রয়েচে—এসব ভাবলে সে এক অপূর্ব, বিচিত্র আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়। জীবনের সেই মধুর-প্রভাত-দিনগুলোর কথা মনে হয়। কাল দিদিমা গল্প করছিল, কবে নাকি সেই জাহ্নবী স্নানে কেওটা গিয়েছিলেন; বাবা সকালে মুখ ধুচ্ছিলেন আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বুড়ি ঠিক মনে করে রেখেচে। সেই দিনটি থেকে জীবন আরম্ভ হয় না?...

এসেই ওদের বাড়ি গেলুম জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে। বিভূতি, ঘণ্টু খুব খেলা করলে। সেখান থেকে এই ফিরচি।

ভারী ঘটনাবহুল দিনটি। ভোরে উঠে প্রথমে গেলুম হেঁটে ইডেন গার্ডেনে। শিশিরসিক্তঘাসের ধারে ধারে বেড়াতে বেড়াতে খালের জলের রক্ত-মৃণালগুলি দেখছিলুম। দুটি রাঙা ফ্রক পরা ফিরিঙ্গি বালিকা ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল। কেয়াঝোপে খানিকটা বসে বসে"আলোক সারথি"র ছক্ কাটলুম। পরে দু'খানা বায়োস্কোপের টিকিট কিনে বাড়িফিরবার পথে রমাপ্রসন্নের ওখান হয়ে এলুম।

বৈকালে প্রথমে গেলুম প্রবাসী অফিসে। কেদারবাবু মোটরে ঢুকচেন, গেটের কাছেনমস্কার বিনিময় হল। সজনীর ঘরে গিয়ে দেখি ডাঃ সুশীল দে বসে আছেন। একটুপরে নীহারবাবুও এলেন। খুব খানিক গল্প-গুজবের পর তিনজনে গেলুম সজনীরবাড়ি। ঊষাদেবী চলে গিয়েছেন। আমার বইখানি গিয়েচেন নিয়ে।

সেখানে "বাঁশি বাজে ফুল বনে" গানটা শুনলুম না বটে, একটা জৌনপুরী টোড়ী রেকর্ড শুনলাম। চা পানের পরে ডাঃ দে বাড়ি চলে গেলেন; আমরা তিনজনে গেলুমবায়োস্কোপে। পথে বার বার চেয়ে দেখছিলুম—আজ পূর্ণিমা, মানিকতলা স্পারেরপিছন থেকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে। বহুদূরের আমাদের বাড়িটাতে নারিকেল গাছটার পিছন থেকে চাঁদটা ওই রকম উঠচে হয়ত। সেই সময়টা সেই"আমার অপূর্ব ভ্রমণ", "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"—সেকি অপূর্ব শৈশবের আনন্দ উৎসাহ,—কি অপূর্ব বিচিত্রজীবনটা তাইশুধুভাবি।

Sunrise film মন্দ নয়। হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে গিরিজাবাবুর সঙ্গে দেখা, নমস্কার বিনিময় ও আলাপ হল।—বাবু B.P.C.C. থেকে returned হয়েচেন শুনলুম, মনটা একটু দমে গেল। বায়োস্কোপ দেখে ফেরবার পথে দীনেশ দাশের সঙ্গেদেখা। প্রবাসী অফিসে মানিকবাবু জানালে, কেদারবাবু মঙ্গলবারে লেখা চান। আবারপ্রবাসীতে যাবার আগে বিচিত্রা অফিসে উপেনবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও খুবশীঘ্র লেখা চান। Sub Editor-এর declarationটা শীঘ্র দিতে হবে তিনি জানালেন।

তারপর বায়োস্কোপ থেকে গেলুম বিভূতিদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে দেখিবৈঠকখানাতে বায়োস্কোপ হচ্চে। বিভূতি বসতে বললে। তারপর দেবেন ও হীরুদের সঙ্গে খেতে বসা গেল। অনেকদিন পরে আজ আবার সেই রাসপূর্ণিমা।

বেরিয়ে অনেকদিন আগের মত একখানা রিকশা করে জ্যোৎস্নায় ও ছাতিম ফুলের গন্ধের মধ্যে দিয়ে বাসায় ফিরলুম। সেই ১৯২৩ সাল ও এই। এই ছয় বৎসরে কতপরিবর্তন।

কে জানত উপরে ডায়েরীটা লিখবার সময় যে এই দিনটাতেই রাসপূর্ণিমারবায়োস্কোপের আসরেই ওদের বাড়ির সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা!

বাসায় এসে বারান্দায় রেলিং ধরে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনেহচ্চিল—যেন এক গ্রহদেব এই অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে হু হু করে উড়ে চলেচেনওপরে—ওপরে—সজোরে—সবেগে—পায়ের নীচে পুরাতন পরিচিত পৃথিবীটি রইলপড়ে—।

বহুদূর আকাশে যেখানে পরমাণু তৈরী হচ্চে, উল্কারা ছুটচে, ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে, নক্ষত্র ছুটচে— সেখানে।

বন্ধুর জ্বর হয়েচে—আজ দাদাকে পত্র দিয়েচি। দাদা যেতে বলেচেন, তা কি করেহয়। সেদিন বন্ধুর অত্যাচারের কথা কত শুনলুম। তার স্ত্রী, বোন ও শাশুড়িঠাকরুন বললেন। শুনে দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় কি!

জ্যোৎস্নারাত্রে আমাদের বাড়িটা বহুদূরে কেমন দাঁড়িয়ে আছে, কাঠ কাটা হয়েচে, আমাদের বাড়ির সামনে ছেলেবেলাকার মত পথের ওপর তার দাগ রয়েছে। শ্যামাচরণদাদাদের কাঠ।

সে এক জীবন!

কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব এই জীবন-ধারা! একে ভোগ করতে হবে।

এই অপূর্ব জ্যোৎস্নায় ইসমাইলপুরের জন্যে মন উদাস হয়ে যায়। যেন তার বিশালচরভূমি, কালো জঙ্গল, নির্জন বালিয়াড়ি—আমায় ডাক দিচ্চে।

কাল স্কুলে ছ'টায় ম্যানেজিং কমিটির মিটিং, এদিকে আবার তিনটার সময় ডাঃ দেরওখানে চা-পানের নিমন্ত্রণ।

আজ দুপুরে মনে পড়ছিল বোর্ডিং-এ থাকতে Traveller's return গল্পটা কিঅপূর্ব emotion নিয়েই পড়তুম। বাল্যের সে সব অপূর্ব emotion মনে পড়লেই মনেহয় কি অপূর্ব, এক বিচিত্র এ জীবনধারা! সেদিনের সন্ধ্যায় নন্দরাম সেনের গলিতে যাওয়া, সেই চাউলের গুদাম—সেই শুভঙ্করী পাঠশালার সামনে আমার সহপাঠীর বাড়িমনে পড়ে।

কি সুন্দর!

এসবের জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেবো? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

আজ মনের মধ্যে যে তীব্র creative আনন্দ অনুভব করলুম, কলকাতায় এসেপর্যন্ত একবছরের মধ্যে তা হয়নি কোনদিন।

আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কি হল আমার, অকারণে আনন্দে মনের পাত্র উপচেপড়চে, একে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না।

মন যেন কি বলে বুঝতে পারি নে। কত কথা মনে হোল।...সারা জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য আজ আমার মনে ভিড় করেচে...স্মরণীয় দিন, অতি স্মরণীয় দিন, এরকমকিন্তু খুব বেশি দিন আসে না।...

ইন্‌স্টিট্যুটে সেই মহিলা পর্যটকের কথা পড়ছিলুম—তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে উত্তরমেরুপ্রদেশের বরফ জমা নদী ও অন্ধকার অরণ্যভূমির মধ্যে তিনি তাঁবু ফেলে রাত্রে বিশ্রামকরতেন, দূরে মেরুপ্রদেশীয় Northern Light জ্বলে, একা তিনি তাঁবুতে—"amidst a waste of frozen river, and dark forests"—সেখানকার নৈশ নীরবতা... নির্জনতা...গভীর শান্তি, মাথার উপর হলুদ রং-এর চাঁদ, অবাস্তব, অন্য গ্রহের জ্যোতিষ্কের মত দেখায়...নৈশ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র...আশেপাশে শুভ্রতুষারাবৃত পাইন অরণ্যেরআড়ালে লোলুপ নেকড়ের দল—আর ভাবতে পারা যায় না, মনকে বড় মুগ্ধ, অভিভূতকরে।

সন্ধ্যাবেলা এসে চেয়ারটাতে বসে চুপ করে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল এই সবশীতের রাত্রে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির পেছনের ঘন বনে শিয়াল ডাকত গভীররাত্রে...সেই বিপদের ভয়, অজানার মোহ, গ্রাম্য জীবনের সৌন্দর্য..অদ্ভুত, অপূর্ব...।

আরও মনে পড়লো ইসমাইলপুরের জ্যোৎস্না রাত্রির সে অপার্থিব, weired beauty...সেই এক পূর্ণিমা-রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নার ঢেউয়ের নীচে আকন্দ গাছ...স্বপ্নেযেন দেখি...

সেই কুমোরদের বাড়ি চাক ঘোরাচ্ছে দাসু...পঞ্চাননতলায় কালীপুজো...

ভগবান, কি অসীম বিচিত্রতা দিয়ে এই জীবন, আমার শুধু নয়, সকলের জীবন গড়ে তুলচো—তা কে দেখে? কে বোঝে?

ধন্যবাদ, অগণিত ধন্যবাদ...হে সৌন্দর্যস্রষ্টা মহাশিল্পী, তোমাকে অন্তরের প্রেম কিবলে জানাবো, ভাষা খুঁজে পাই না...

এ তো শুধু পৃথিবীর সুখদুঃখের কথা লিখচি—তবুও তো আজ নাক্ষত্রিক শূন্যেরকথা ভাবিনি, অন্য অন্য জগতের কথা তুলিনি। অন্য গ্রহ-উপগ্রহের কথা ওঠাইনি...

দূর-দূরান্তের কথা তুলিনি...

নতুন বৎসরের প্রথম দিনটাতে এবার মোটরে করে শ্রীনগর গেলুম। চালকী থেকেখুকীকে তুলে নিলুম, পরে গোপালনগরের বাজারে বঙ্কুর ড্রাইভার গৌরকে হরিবোলাঠিক করে দিলে। ড্রাইভারটা প্রথমটাতে মেঠো পথে যেতে চায় না। অবশেষে অনেককরে রাজী করানো গেল। সিমলাতে গিয়ে কালাকে ডাকতে পাঠানো গেল, সে নাকিভাত রাঁধচে। একটি ছোট মেয়ে জল নিয়ে এল বালতিতে করে। খাবার খেয়ে নিয়েআমরা আবার হলুম রওনা। শ্রীনগরের বনের মাথায় মটর ফুলের মত একরকম ফুলঅজস্র ফুটে আছে, এত চমৎকার লাগছিল। আসবার সময় ডাইনে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল—আকাশের কি চমৎকার রঙটা যে !

রাত আটটার সময় পৌঁছে গেলুম কলকাতা, ঠিক চারটার সময় সিমলে থেকে ছেড়ে। এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। Sense of space মানুষের ক্রমেই কেমনপরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।...এক শত বৎসর পূর্বে যা কিনা পাকা তিন দিনের পথ, গরুরগাড়িতে চার দিনের পথ ছিল! ...কে জানে আমাদের পৌত্র বা প্রপৌত্রদের sense of space আরও কত পরিবর্তিত হবে!—

আজ অনেকক্ষণ কার্জন পার্কে একা একা বেড়ালুম। পশ্চিম আকাশে সূর্যটা অস্তযাচ্ছিল,—আমার শুধু মনে যুগ যুগের কল্পনা-জাগে। ঐ নক্ষত্রটা যে ওইখানে উঠেছে, ওতেও কত অপূর্ব জীবনশীলা...। মৃত্যু, বিরহ এসব যদি জীবনে না থাকত তবেজীবনটা একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ত—হারাবার শঙ্কা না থাকলে প্রেম, স্নেহও হয়তো গভীর মধুর হতে পেত না। তাই যেন মনে হয় কোন সুনিপুণ শিল্প-স্রষ্টা এর এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেচেন যেন অতি তুচ্ছ, দরিদ্র লোকেরও জীবনের এ গভীরঅনুভূতির দিকটা বাদ না যায়। এ জীবনের অবদানকে খুব কম লোকেই বুঝলে—কেউ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না—সকলেই দৈনন্দিন আহার চিন্তায় ব্যস্ত। কে ভাবে জন্ম নিয়ে,আকাশ, ঈশ্বর, প্রেম, অনুভূতি—এসব নিয়ে কার মাথাব্যথা পড়েচে?

নুটু ও নায়েব ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম।—Lief Ericsson was space hungry; So am I.

জানি না কেন আজ ক'দিন থেকে মনটা কেবলই মুক্তির জন্য ছটফটকরচে। কিভাবের মুক্তি। আমাকে কি কেউ শিকলে বেঁধে রেখেচে?—তা নয়। কিন্তু কলকাতার এই নিতান্ত মিনমিনে, একঘেয়ে, ঘরোয়া জীবনযাত্রা, আজ পনেরো বৎসর ধরে যেজীবনের সঙ্গে আমি সুপরিচিত,—সেই বহুবার দৃষ্ট, গতানুগতিক, একরঙা ছবির মতবৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা আর আমার ভাল লাগে না।

আজ দুপুরবেলা স্কুলের অবসর ঘণ্টায় চুপি চুপি এসে বাইরের ছাদটাতে বসেছিলুম।আকাশ ঘন নীল, কোথাও এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে—কেবল একটা চিল বহুদূরে একটা কৃষ্ণ-বিন্দুর মত আকাশের গা বেয়ে উড়ে যাচ্ছে—সেদিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে আমার মন কোথায় যে উড়ে গেল, কি অপূর্ব প্রসারিত করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে মনে জাগল—সে-সব কথা কি লিখে বলা যায়?মনের সে উচ্চ আনন্দের বর্ণনাদেওয়ার উপযুক্ত ভাষা এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু কেন সে আনন্দটা এল, তাও বুঝতেপারি—সেটা এল শুধু জগতের বড় বড় মরু, বিশাল অরণ্যভূমি, দিক্‌দিশাহীন সমুদ্র, মাঠ ও বনঝোপ, মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব মুক্ত রূপের কল্পনায়।

বুঝতে পারি এরই জন্যে মনটা হাঁপাচ্চে। প্রকাণ্ড কোনো মাঠের ধারে বন, বনেরপ্রান্তে একটি বাংলো—কিংবা জঙ্গলে ঘেরা অভ্রের খনি, বালু-মিশ্রিত পাথুরে মাটিরগায়ে অভ্রকণা চিক্‌চিক্ করচে, নয়তো উচ্চাবচ পাহাড়ে জমি, যেদিকে চোখ যায় শুধুইবন—এই রকম স্থানেই যেতে চাই—থাকতে চাই। এতটুকু স্থান চায় না মন। চায়আরও অনেক বড় জায়গা—অনেকখানি বড় অচেনা অজানা, রুক্ষ, কর্কশ ভূমিশ্রীহলেও তা-ই চাইবো, এ একঘেয়ে পোষমানা শৌখিনতার চেয়ে।

সন্ধ্যাবেলা যে ছবিটা দেখতে গেলুম গ্লোবে, সেটাও আমার আজকের মনের ভাবেরসঙ্গে এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেল,—'Lief the Viking' গ্রীনল্যান্ড ছেড়ে আরও দূরে, অচেনা দেশ খুঁজে বার করতে অজানা পশ্চিম মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়েচলে গেল—নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না-ঝরা আকাশ-তলায় সদ্য-ফোটা মরসুমী ফুলগুলোরদিকে চোখ রেখে এইমাত্র গোলদীঘির ধারে বসে সেই কথাই আমি ভাবছিলুম।...

ভাবতে ভাবতে মনে হল আমি যেন এই জগতের কেউ নই—আমি যেন বহুদূর কোন নাক্ষত্রিক শূন্যপারের অজানা জগৎ থেকে কয়েক দণ্ডের কৌতূহলী অতিথির মতপৃথিবীর বুকে এসেচি—ও মরসুমী ফুল আমি চিনেও চিনি না, প্রতিবেশী মানুষদের দেখেও যেন দেখিনি, এ গ্রহের বৈচিত্র্যের সবটাই নিয়েচি কিন্তু এর একঘেয়েমিটাআমার মনে বলতে পারেনি এখনও। তার কারণ আমার গতি—স্বর্গীয় গতির পবিত্রতা।

মনে হল এইমাত্র যেন ইচ্ছা মত পৃথিবীটা ছেড়ে উড়ে আলোকের পাখায় চলে যাবো ওই বহুদূরে ব্যোমের গভীর বুকে, যেখানে চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটানির্জন সাথীহীন নক্ষত্র মিট্‌মিট্ করে জ্বলচে—ওর চারপাশে হয়তো আমাদের মতকোন এক জগতে অপরূপের বিবর্তনের প্রাণী বাস করে—আমি সেখানে গিয়ে খানিকটাকাটিয়ে আবার হয়তো চলে যাবো কোন্ সুদূর নীহারিকা পার হয়ে আরও কোন্ দূরতরজগতের শ্যামকুঞ্জবীথিতে!

এই সময়ে মৃত্যুর অপূর্ব রহস্য যা সাধারণ চক্ষুর অন্তরাল থেকে গোপন আছে—তার কথা ভেবে মন আমার অবাক হয়ে গেল—সারা দেহ মন কেমন অবশ হয়েগেল।...

কোন্ বিরাট শিল্প-স্রষ্টার পুণ্য অবদান এ জীবন?...কি অতলস্পর্শ, মহিমময়রহস্য! ...রোমাঞ্চ হয়। মন উদাস হয়ে যায়—যখন বাসায় ফিরলুম, তখন যেন কেমনএকটা ঘোর ঘোর ভাব।...

জীবনকে যে চিনতে পেরেছে—এ জগতে তার ঐশ্বর্যের তুলনা নেই—যার কল্পনারপঙ্গুতা ও ভাব-দৈন্য দৈনন্দিন ভোগবিলাসের ঊর্ধ্বে তাকে উঠতে প্রাণপণে বাধাদানকরেচে, সে শাশ্বত-ভিখারীর দৈন্য কে দূর করবে?...

আজ অনেককাল পরে—প্রায় বারো বৎসর পরে—শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখে এইমাত্র ফিরচি। সেই ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেখবার পরে এইআজ দেখা। অভিনয় খুব ভালই হল, কিন্তু আমি, কি জানি কেন, মনের মধ্যে প্রথমযৌবনের সে অপূর্ব উন্মাদনা, নবীন, টাটকা, তাজা মনের সে গাঢ় আনন্দানুভূতিটুকুপেলাম না। দেখে দেখে যেন মনের সে নবীনতাটুকু হারিয়ে ফেলেছি।

আজকাল অন্যদিক দিয়ে মনের মধ্যে সব সময়ই একটা অপূর্ব উৎসাহ পাই—একটা অন্য ধরনের উদ্দীপনা। সেটা এত বেশি যে, তা নিয়ে ভাবতেও পারি না—ভাবলে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মনে হয় এই যে কলকাতার একঘেয়েমি যাকে বলচি—এ-ও চলে যাবে। সেযাত্রার বাঁশি যেন বেজেছে মনে হচ্চে। বহুদূরে যাত্রা। সমুদ্রের পারে—প্রশান্ত মহাসাগরেরপারে।

নানা দার্শনিক চিন্তা মনে আসচে, কিন্তু রাত হয়েচে অনেক—আর কিছু লিখবোনা।

ক'দিন বেশ কাটচে। অনেক দিন পরে ক'দিনের মধ্যে ভোম্বলবাবু, ননী, নানু, প্রসাদ—এরা সব এসেছিল। সেদিন অনেকদিন পরে রাজপুরে চললুম। খুকীর সঙ্গে দেখা হল, ভারী আদর করলে। তারপর একদিন গড়িয়ায় জলের ধারের মাঠে, আমিও ভোম্বল বেড়াতেও গেলুম। কত কিগল্প আবার পুরনো দিনের মতই হল। একদিনআমি অবশ্য একা গিয়েছিলুম,—পূর্ণিমার দিন।

আজ বসে বসে সেই দিনগুলোর কথা ভাবছিলুম। যাত্রাদলের ছেলে ফণি বাড়িতেখেতে এল—বাবা বর্ধমান থেকে এলেন—তারও অনেক আগে যখন বকুলতলায়প্রথম বারোয়ারীর বেহালা বাজানো শুনে অবাক হয়ে

গিয়েছিলুম—সে-সব টাটকা—তাজা, আনকোরা আনন্দ এখনও কিন্তু যেন ভাবলে কিছু কিছু পাই। যেদিন সেই প্রথম বেহালা বেজেছিল, যেদিনটা বাবার সঙ্গে নৈহাটী হয়ে সিঙ্গাড়ার আলু খেয়ে কেওটা থেকে বাড়ি আসছিলুম—যেদিন চড়ক তৈরি করলুম—ঠাকুরমাদের বেলতলায় আমি নিজে; ঠাকুরমাদের পোড়ো ঘরে পাঠশালা-করা, কড়ি খেলার আমোদ, পুবমুখো যাওয়া, মরাগাঙে মাছ ধরতে যাওয়া—শনিবারে ছুটিতে বাড়ি আসার আনন্দ— কত লিখবো।কে জীবনের এসব মহনীয় অবদান-পরম্পরার কথা লিখতে পারে? আর মনে হয় আমি ছাড়া এসবের আসল মানে আর কে-ই বা বুঝবে? তা তো সম্ভব নয়—অন্যসকলের কাছে এগুলো নিতান্ত মামুলী কথা মনে হবে। এদের পিছনে যে রসভাণ্ডারলুকানো আছে আমি ছাড়া আর কে জানবে?...

অনেকদিন পরে দেশে এসে বেশ আনন্দে দিন কাটচে। রোজ সকালে উঠে ইছামতীরধারের মাঠটাতে বেড়াতে যাই, ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকে, এত পাখি ডাকে! ... চোখ গেল, বৌ-কথা-ক', কোকিল—কত কি!... বেড়িয়ে এসে ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নামি। ওপারের চরের শিমুলগাছটার মাথায় তরুণ সূর্য ওঠে, দু'পারে কতশ্যামল গাছপালা। সোঁদালি ফুলের ঝাড় মাঝে মাঝে দেখলেই আমার মনে কেমনঅপূর্ব আনন্দ ভরে ওঠে! ...প্রভাতে পাখিরা যে কত সুরে ডাকে, জলের মধ্যে মাছেরঝাঁক খেলা করে।—জীবনের প্রাচুর্যে সরসতায়, সৃষ্টির মহিমায় অভিভূত হয়ে যাই। কতদূরের সব জীবনধারার কথা, জগতের কথা মনে হয়—আবার স্নান করতে করতে চেয়ে দেখি নদীর ধারে গোছা গোছা ঘাস হেলাগোছা ভাবে জলের মধ্যে মাথা দোলাচ্ছে, একটা হয়তো খেজুর গাছ গাজিতলার বাঁকে অন্য সব গাছপালার থেকে মাথা উঠিয়েআছে।

অপূর্ব, সুন্দর, হে স্রষ্টা, হে মহিমময়, নমস্কার, নমস্কার। অন্য সব জগৎও যে দেখতে ইচ্ছে যায়, দেখিও।

রোজ বৈকালে কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে; মেঘ হয়, রোজ, রোজ। ঠিক তিনটা বেলাবাজতে না বাজতে মেঘ উঠবে, ঝড়ও উঠবে। আর সমস্ত আমবাগানের তলাগুলোধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরে যায়—সল্‌তে-খাগীতলা[2], তেঁতুলতলা, শ্যামাচরণদাদাদের বাগানটা, নেকো, পটুলে, বাঁশতলী—সমস্ত বাগানেযাতয়াতের ধুম পড়ে গিয়েচে—।

সেদিন ঘনমেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার সবাই—স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বালকেরা ধামা হাতে আম কুড়ুচ্চে দেখে আমার চোখে জল এল। জীবনে ও-ই এদের কত আনন্দের, কতসার্থকতার জিনিস।...একটা ছেলে বলচে—ভাই—ওই দোম্‌কাটায় মুই যদি না আসতাম, তবে এত আম পেতাম না!....

কাল সাতবেড়ে মেয়ে দেখতে যাবো।...

সারা গ্রামটাতে বিল্বগাছের ফুলের কি ঘন সুগন্ধ! ...অশ্বত্থতলায়, যেখানে সেখানেএত বেলের গাছও আমাদের এখানে আছে!

কাল সাতবেড়ে গ্রামে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এলাম। শশী বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়িখুব আহার হল। গ্রামখানিতে সবই চাষা লোকের বাস, ভদ্রলোকের বাস তত নেই, তবে সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। মাটির ঘরগুলো সেকেলে ধরনের, কোনো নতুন আলোএখনও ঢোকেনি বলে সেখানের অকৃত্রিম আবহাওয়াটা এখনও আছে। ফণি কাকা ওআমি দুজনে দক্ষিণ মাঠের দায়েমের পুকুরের ধার দিয়ে বেশ ছায়ায় ছায়ায় বৈকালেরদিকে চলে এলাম। নফর কামারের কলাবাগানের কামারবুড়ি কি ফলমূল ও কাঁকুড়নিয়ে আসচে দেখলাম। হরিপদ দাদার স্ত্রী বাগানে আম পাড়াচ্চেন।

---

[2]'পথের পাঁচালী'তে এই আমগাছটির উল্লেখ আছে।

আজকাল রোজ বৈকালেই মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি হওয়ার দরুন কুঠির মাঠে একদিনওবেড়াতে যাওয়া হয় না। রোজই কালবৈশাখী লেগে আছে। সুন্দর বৈকাল একদিনও পেলাম না। তিনটা বাজতে না বাজতেই রোজ জল আর ঝড়।

আজও সকালে নদীতে স্নান করে এলুম। কি সুন্দর যে মনে হয় সকালে স্নানটাকরা, স্নিগ্ধ নদীজল, পাখির কলকাকলী, মাছের খেলা, নতশীর্ষ গাছপালা, নবোদিতসূর্যদেব।

আজ বেড়াতে গেলুম বৈকালে কাঁচিকাটার পুলটাতে। সকালে অনেকক্ষণ চেয়ারপেতে ওদের বেলতলাটায় বসেছিলুম, সেখানে কেবল আড্ডাই হল। বেলা যখন বেশপড়ে এসেচে তখন গেলাম ঠাকুরমাদের বেলতলাটায়, ফিরচি একজন লোক জটেমারীরকুঠি খুঁজচে আমাদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে। তারপর নিজে গেলাম বেলেডাঙারপুলটায়। একখানা যেন ছবি, যখন প্রথম অশ্বত্থতলার পথটা থেকে ওপারের দৃশ্যটাদেখলাম—এ রকম অপূর্ব গ্রাম্যদৃশ্য ক্বচিৎ চোখে পড়ে। বেলেডাঙা গ্রামের বাঁশবনেরসারি নদীর হাওয়ায় মাথা দোলাচ্চে, কৃষক-বধূরা জল নিতে নামচে বাঁওড়ের ঘাটে।দুপারে সবুজ আউশের ক্ষেত, মজুরেরা টোকা মাথায় ক্ষেতেক্ষেতে ছাঁটার কাজ করচে, ছোট ডোঙা চেপে কেউবা মাছ ধরতে বেরিয়েচে—যেন ওস্তাদ শিল্পীর আঁকা এক অপূর্বভূমিশ্রীর ছবি।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথায় মোট নিয়ে পাঁচপোতা থেকে ফিরচে—গোঁসাইবাড়িরকাছে বাসা করেচে বললে—নাম বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়। দেখে ভারী কষ্ট হল—একাভাগ্যহীন, অসহায় মানুষ। বললে, শীতলা ঠাকুর নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়াই—যে যা দেয়, তাতেই চলে। বাড়িতে এক ছোট ছেলে আছে, ও দুটি মেয়ে।

বসে বসে অনেকক্ষণ হাওয়া খেলুম, সঙ্গে সঙ্গে কত দেশের জীবনধারার কথা, বিশেষ করে যারা দুঃখ পেয়েচে তাদের কথাগুলো বড় বেশি করে মনে হল। ভরতের মা দিন-রাত দুঃখ করচেন, তার দুঃখ শুনে সত্যি মনে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে জগতের এত আনন্দ ধারার এক কণাও এরা পাচ্চে না—হয়তো শুধুদেখবার চোখ নেই বলেই।

ফিরবার পথটি আজ এত ভাল লাগল, ওরকম কোনো দিন লাগে না—ডাঁশাখেজুর ও নোনা ডালে ডালে দুলচে—এত পাখির গানও এদেশে আছে! ...কুঠির মাঠটা যে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে—ইতস্তত প্রবর্ধমান গাছপালা বনঝোপের সৌন্দর্যে বিশেষ করে যেখানে সেখানে, যেদিকে চোখ যায়—ডাল-ভরা সোঁদালি দোলায়িত।আকাশের রঙটা হয়েচে অদ্ভুত—অপূর্ব নির্জনতা শুধু পাখিদের কল-কাকলীতে ভগ্নহচ্চে—কেউ কোনো দিকে নেই—ধূসর আকাশতলে গভীর শান্ত ও ছায়ার মধ্যেকেবল আমি ও মুক্ত উদার প্রকৃতি।

কি অপূর্ব আনন্দেই মন ভরে যায়, কত কথাই মনে ওঠে, সাধ্য কি কলকাতায়থাকলে এ সব কথা মনে উঠতে পারে!..

তারপর ওপাড়ার ঘাটটিতে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে নেমে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্যামল, ধূসর বৃক্ষশ্রেণী, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, স্বচ্ছ নদীজল—মাথার ওপরে সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি উঠেচে, সেদিকে চেয়ে কতশত নক্ষত্রমণ্ডলী, বিভিন্নমুখী নক্ষত্রস্রোত, অন্য অন্য নীহারিকাদের জগতের কথা মনে হল। বৃহৎ এন্ড্রোমিডা নীহারিকাদের জগৎ।এই সামান্য, ক্ষুদ্র গ্রহটাতে যদি অস্তিত্বের এত বৈচিত্র্য, এত সরসতা, এত সৌন্দর্য—তবে না জানি সে-সব বিশ্বে কি অপরূপ আনন্দস্রোত।...

সব দুঃখের একটা সুস্পষ্ট অর্থ হয়। জীবনের একটা মহান, বিরাট অর্থ, একটাসুস্পষ্ট রূপ মনের চোখে ফুটে ওঠে। নির্জন স্থান ভিন্ন, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ভিন্ন,—এ আনন্দ কি সম্ভব?

...সন্ধ্যার পরে আমি, সইমা, ন'দি অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। আজকাররাতটা কালকার মত গরম নয়, শেষ রাত্রে মেঘ করার দরুন বেশ ঠাণ্ডা। সারারাত লণ্ঠন ধরে ধরে লোকেরা ও ছেলেদের দল আমাদের বাড়ির পিছনের ঘন জঙ্গলের ওপারের বাগানগুলোতে আম কুড়িয়েচে, সারা রাতটি।

কি সুন্দর বৈকালটি কাল কাটলো যে! কুঠির মাঠে অনেকক্ষণ বসে; পরে নদীজলেসন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্নান করতে নামা গেল। এত অপূর্ব ভাব এল মনে, ঠাণ্ডা নদীজল, ছিপি-শেওলার পাতার ধারে দাঁড়িয়ে, ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশ ও শ্যামল গাছগুলোরদিকে চোখ রেখে শুধুএদের পিছনে যে বিরাট অবর্ণনীয় শক্তি জাগ্রত আছে, তার কথাইবার বার মনে আসছিল। স্বচ্ছ জলের ভেতরে মাছের দল খেলা করচে—একটা ছোট মাছ তিড়িং করে লাফিয়ে শেওলার দামের গায়ে পড়ল। নদী জলের আর্দ্র, সুগন্ধ উঠচে—ওপারে মাধবপুরের পটোলের ক্ষেতে তখনও চাষারা নিড়েন দিচ্চে—বাদামগাছের মাথায় একটা নক্ষত্র উঠেচে। সারাদিনের গুমোটের পর শরীর কি স্নিগ্ধইহল! ...

শেষ রাত্রে বেজায় গুমোট গরমে আইঢাই করছি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টিএল। ন'দি, জেলি, বুড়ি-পিসিমা, জেলে পাড়ার ছেলেরা অমনি আম কুড়ুতে ছুটল। ঘনঅন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠন জ্বেলে সব ছুটল চাটুয্যে বাগানের দিকে। জেলির মা চেঁচিয়ে পিছু ডাকাতে জেলি আবার এল ফিরে।...

সকালটার সিঁদুরে মেঘে অপরূপ শোভা হয়েছিল। পরশু বৈকালটিতে এই রকমই সিঁদুরে মেঘ করেছিল—আমি সেটা উপভোগ করতে পারিনি, গোপালনগরের হাটেগিয়েছিলাম।

আজ প্রায় বাইশ বছর পরে ভাণ্ডারকোলায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বেলেডাঙার মাঠে যে অদ্ভুত মনের রূপ ও প্রকৃতির রূপ দেখেছিলাম, অমন কখনো দেখিনি। কাঁচিকাটার পুল থেকে ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়েবুড়োর পত্রটা পকেট থেকে পড়চি—প্রমীলা মারা গিয়েচে লিখচে। সামনে অপূর্বরঙের আকাশটা ঘন হীরাকসের সমুদ্রের মত গাঢ় ময়ূরকণ্ঠী রঙের, পিছনে বর্ণ-সমুদ্র, কোথাও জনমানব নেই—গাছে গাছে পাখির ডাক, দূরে গ্রামসীমায় পাপিয়া সুর উঠিয়েচে,—জীবনের অপূর্বতা কি চমৎকার ভাবেই...সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আকাশটার দিকেচেয়ে মনে হল।...

কাল বৈকালের দিকে বেলেডাঙার বট-অশ্বত্থের পথটা বেয়ে বেড়াবো বলে, কুঠিরমাঠের পথটা দিয়ে চললুম সেদিকে—মাঠে পড়েই অবাক হয়ে পশ্চিম আকাশে চেয়েরইলুম—মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলুম। সারা বেলেডাঙার বনশ্রেণীর ওপর ঘন কালো কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘ জমেচে—অনেকটা আকাশ জুড়ে অর্ধচন্দ্রকার মেঘচ্ছটা—আর তার ছায়ায় চারিধারের বাঁশবন, ঘন সবুজ শিমুল ও বট গাছগুলো, নীচেরআউশের ক্ষেত, বাঁওড়—সবটা জড়িয়ে সে এক অপরূপ মূর্তি ধরেচে। বিশেষ করেছবি দেখতে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েচে এক শিমুল ডালের—তার সোজা মগ্‌ডালটামেঘের ছায়ায় ও উড়নশীল ঘন কালো-মেঘে ঢাকা আকাশের পটভূমিতে কোনোদেবশিল্পীর আঁকা মহনীয় ছবির মত অপূর্ব। সেইটি দেখে চোখ আর আমার ফেরে না—কেমন যেন পা আটকে গেল মাটির সঙ্গে, অবশ হয়ে গেলুম, দিশাহারা হয়ে পড়লুম—ওঃ!—সে দৃশ্যটার অদ্ভুত সৌন্দর্যের কথা মনে এলে এখনও সারা গা কেমন করেওঠে।

তারপরই সাঁ-সা রবে ওপারের দিক থেকে বিরাট ঝড় উঠলো—দৌড়, দৌড়, দৌড়—হাঁপাতে হাঁপাতে যখন গেঁয়োখালী আমতলাটায় পৌঁছিয়েচি—আমাদের গ্রামেরকোলে—তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেচে—জেলি আর প্রিয় জেলের ছেলে আম কুড়ুচ্চে—একটি দরিদ্র যুবককে আগ্রহ সহকারে আম কুড়ুতে দেখে চোখে জল এল। কি দিয়েচেজীবন এদের? অথচ এরা মহৎ, এদের দারিদ্র্যে এরা মহৎ হয়েচে। অতিরিক্ত ভোগে ও সাচ্ছল্যে জীবনের সরল ও বন্ধুর পথটাকে হারায়নি।...

স্নান সেরে এসে বকুলতলার ছায়ায় বসে ওপরের কথাগুলো লিখলাম। মাথারওপর কেমন পাখিরা ডাকচে—ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল—আর একটা কি পাখী—পিড়িং পিড়িং করে ডাকচে, কত কি অস্ফুট কলকাকলী—কি ভালই লাগে এদেরবুলি! ...

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম। শিমুলগাছের এত অপরূপ শোভা তা তো জানতাম না। ঝোপের মাথায় কি নতুন কচি লতাসাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্যের ভারে—চারিধারেচেয়ে—এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখির গানের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছেবলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম প্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন—বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হল ওদের সঙ্গে কতদিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আতুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির ঠাক্‌রুনের,—কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা-পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লীবালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরাজ বালক-বালিকার, গাং-চিল পাখির ডিম সংগ্রহ করতেগিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—Cape Wan-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি—কত কি, কত কি !

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত শান্ত—সন্ধ্যা কেউ নেই ঘাটে, ওপারের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেচে—একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর—এ কোনো অনন্ত দেশের বাণীর মতএই শর্ত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের ঊর্ধ্বে জ্বল জ্বল করে জ্বলচে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি, ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ—কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখেছি বলে মনেহয় না—বিশেষ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন বৈকালগুলি—যেদিন সূর্য অস্তযাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলেকটুকু পর্যন্ত বড় গাছের মগ্‌ডালেহালকা সিঁদুরের পোঁচের মত দেখা যায়—সেদিনের বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা-আলো,ডাঁসা খেজুর ও বিল্বপুষ্পের অপূর্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরনেরপাখি-ডাকা, মিষ্টি সে বৈকালগুলিতে, মন সব অদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়, দু-একটা পাখি ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে—কি উদাস, করুণ হয়ে ওঠে তখনচারিদিকের ছবিটা, বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুমাদের বেলতলাটায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসেছিলাম, তখন—তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। আজ জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ কিন্তু এখনও বিল্বপুষ্পের গন্ধ সর্বত্র, পাখির ডাকের তো কথাই নেই—সোঁদালিফুল এখনও আছে, তবে পূর্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আসার পথে লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্চে।

এ সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম, যত স্থানে বেড়িয়েচি, আনন্দ সবচেয়ে বেশি গাঢ় ও উদাস ভাবে আমি পাচ্চিশুধুএই এখানে—কোনোCosmic thoughts আটকায় না, বরং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়—খুব ভালকরে ফোটে। তবে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানেকোনো শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখলুম। বিকেল হতে না হতে কেবল মন আন্‌চান করে—রাত্রিতে কাজে মন বসে না—এ যেন Land of Lotus-eaters, কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্চি দু-একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলো একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখির ডাকে ভরপুর, আর বৈকালে তো ওইরকম স্বর্গীয়, অপরূপ, এ পৃথিবীর নয় যেন—তবে আর লিখি কখন?

মনে মনে তুলনা করে দেখলুম এ ধরনের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখিনি—এই তো পাশেই চালকী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখি সেখানে নেই, এধরনের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই, বনজঙ্গল বড় বেশি, কাজেই অন্ধকার—এমন চাপা আলোটা হয় না—এ একটা অপূর্ব সৃষ্টি,এতদিন তত লক্ষ্য করিনি, কাললক্ষ্য করে দেখে মনে হল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখিনি তো। দেখবোও না—কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল।ইসমাইলপুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে—সে অন্য ধরনের প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও কারুকার্য কম—বিপুলতা বেশি, প্রখরতা বেশি।

ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরনের পাখি, বিশেষ ধরনেরবনবিন্যাস, বিশেষ ধরনের গাছপালা থাকাতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরনেরবৈকাল সম্ভব হয়েচে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড় সম্পদ, মাঠে, বনে ওর ঝাড়যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়—বনদেবীর একটা অযত্নচয়িতবনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয়—এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেচে তা আর কোনো ফুলে দেখলাম না।

এই সুন্দর দেশে বাস করেও যারা মানসিক কষ্ট পাচ্ছে, আমার সইমার মত—তাদের সে কষ্ট সম্ভব হচ্চে শুধু অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জন্য। মনের সাহস এদেশটাহারাতে বসেচে—কল্পনার উদারতা নেই, সুদৃঢ় বিস্তীর্ণতা নেই—দৃষ্টি সেকেলে ও একপেশে, তার ওপর মনের মধ্যে জ্বলেনি জ্ঞানের বাতি। এত করে সইমাকে বোঝাই, সে শিক্ষাসইমা নেয় না, নিতে পারবেও না—কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও কাশীরাম দাস এবংকৃত্তিবাস ওঝার প্রচলিত কতকগুলোFalse Philosophy এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদেরমনের সর্বনাশ করেচে। জীবনের সহজ দর্শন এদের নেই, বুড়ো বয়সেও ভাল করেএখনও চোখ ফোটেনি—কি করা যায় এদের জন্যে, সর্বদাই সে কথা ভাবি। শিক্ষা দ্বারা মানুষ নিজেকে নিজে পায়, এইটাই জীবনের বড় লাভ। ভগবানকে পাবার আগে নিজেকে লাভ করা যে আবশ্যক তা এরা ভুলে গিয়ে শুধু ভগবান, ভগবান বলে নাকে কাঁদতে থাকে, নিতান্ত দুর্বল জড়মতির মত। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এ কথা এরাশোনেও কী কোনোদিন।

সারা পল্লী-অঞ্চলগুলো এমন হয়ে আছে, এদের দুঃখ দূর করতে গেলে তো জঙ্গল কাটালে হবে না, মশাতাড়ালেও হবে না (সেটা যে অনাবশ্যক, তা আমি বলচি না), মাসিক কিছু অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করলেও হবে না—এর জন্যে চাই জ্ঞানের আলো—উদার, বিপুল, দীপ্ত জ্ঞানের সার্চলাইট।

আজ অনেকক্ষণ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। সেকালের অনেক কথা হল।ওই সবই আমার জানবার বড় ইচ্ছে। ঠাকুমাদের চণ্ডীমণ্ডপের ভিটাতে দুর্গোৎসব হত, বড় উঠোন ছিল—আন্নাপিসি দুবেলা গোবর দিতেন, খুব লোকজন খেত—নারকেলগাছের পাশে ওই যে সুঁড়ি গলিটা ওইটা ছিল খিড়কির দোর—মেটে পাঁচিল ছিল ওদিকটা। গোলক চাটুয্যে ছিলেন বাবার মামাতো ভাই—পিসিমার মা ছিলেন ব্রজচাটুয্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুয্যের মেয়ে। প্রসঙ্গত বলা যাক যেআজই রাখালী পিসিমার মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেল। যাবো যাবো করে আরঘটে উঠল না। পিসিমার শ্বশুরবাড়ি ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ রাখালী পিসিমার ভাই, ভারী সুন্দর দেখতে ছিল—কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে। সইমাদেরবাড়িতে আসার সময় ওই পথটাতে প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ নাকি ছিল—তার তলায়অনেক লোক বসতো। হরি ঠাকুরদাদা তাঁর মাকে খেতে দিতেন না, মায়ের সঙ্গে ভিন্নছিলেন, তাঁর দেওর গোঁসাই-বাড়ি ঠাকুর পুজো করে দু-পাঁচ টাকা যা জমাতো, তাইদিয়ে দরিদ্র বৃদ্ধাকে ধান কিনে দিয়ে যেত।

বৈকালে নলে জেলের নৌকাতে বেড়াতে গেলুম মোল্লাহাটির দিকে। ছ'টার সময়আমাদের ঘাট থেকে নৌকাখানা ছাড়া হল। নদীর দুধারে অপরূপ শোভা, কোথাওবাবলা গাছ ফুলের ভারে নত হয়ে নদীর ধারে ঝুঁকে আছে, দুধারে ঘাস-ভরা নির্জনমাঠ, ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, গাঙ শালিকের দল কিচ্-কিচ্ করচে, বাঁ ধারেক্রমাগত জলের ধারে ধারে নলবন, ওক্ড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ—মাঝে মাঝে চাষীদেরপটোল ক্ষেত, বেলেডাঙার ঘোষেরা যে নতুন ক্ষেতটাতে পটোল করেচে, তাতে টোকামাথায় উত্তরের মজুরেরা নিড়েন দিচ্চে, ওদিকে কুমড়োর ক্ষেত—ঢালু সবুজ ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁয়ে আছে, গরু চরছে, বাঁকের মোড়ে দূরে খাব্রাপোতা গ্রামেরবাঁশবন, সুবৃহৎ lyre পক্ষীর পুচ্ছদেশের মত নতুন বাঁশের আগা—একটু একটু রোদমাখা। নদীজলের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বেরুচ্চে, মাথার ওপরকার আকাশ ঘন নীল, কিন্তুপশ্চিম দিগন্তে গ্রাম সীমায় শিমুল, কদম গাছের মাথায় মাথায় অপরূপ মেঘস্তূপ, মেঘের পর্বত—মেঘের গিরিবর্ত্মের ফাঁকটা দিয়ে অস্তসূর্যের ওপারের দেশের খানিকটাযেন দেখা যায়।

খানিকটা গিয়ে একধারের পাড় খুব উঁচু, বন্য নিমগাছের সারি, পাড়ের ধারে গাঙশালিকের গর্ত, নীল মাছরাঙা পাখি শেওলার ধারে ধারে মাছ খুঁজতে খুঁজতে একবারওঠে, একবার বসে—খেজুরগাছ, গাবভেরান্ডা, বৈঁচিফুলে ভর্তি সাঁইবাবলা, আকন্দেরঝোপ, জলের ধারের নলবন, কাশ, ষাঁড়া নোনা, গুলঞ্চলতা-দোলানো শিমুল গাছ, শালিক পাখি, খেঁকশিয়ালী, বাঁশঝাড়, উইঢিবি, বনমুলোর ঝাড়, বকের দল, উঁচু ডালেচিলের বাসা, উলুঘাস, টোপাপানার দাম। সামনেই কাঁচিকাটার খেয়াঘাট, দুখানা ছোট চালাঘর, জনকতক লোক পারের অপেক্ষায় বসে—ডানধারের আকাশটায় অপূর্বহীরাকসের রঙ ধরেচে—গাঢ়, নীল।

আবার দু-পাড় নির্জন, এক এক স্থানে নৌকা তীরের এত নিকট দিয়ে যাচ্ছে যে কেলেকোঁড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। বেলা আরও পড়ে এল, চারিদিকে শোভা অপরূপ, লিখে তা প্রকাশ করা যাবে না।ডাইনে ঘন সবুজ ঘাসের মাঠ, বামে আবারউঁচু পাড়, আবার বাবলা গাছ, শিমুলগাছ, ষাঁড়া গাছ, পাখির দল শেষ-বেলায় ঝোপেঝোপে কলরব করচে—দূরে গ্রামের মাথায় মেঘস্তূপটা পেছনে পড়েচে—এক এক স্থানে নদী-জল ঘোর কালো, নিথর কলার পাতার মত পড়ে আছে— দেখাচ্চে যেনগহন, গভীর, অতলস্পর্শ। বাঁকটা ঘুরেই অনেকখানি আকাশ একসঙ্গে দেখা যাচ্চে, পশ্চিম আকাশের কোলে যেন আগুন লেগেচে—অনেকখানি দূর পর্যন্ত মেঘে, আকাশে, গাছের মাথায় মাথায় যেন সে আগুনের আভা, খাব্‌রাপোতার ঘাটের পাশে কোন দরিদ্র কৃষক-বধূ জলের ধারের কাঁচড়াদাম শাক কোঁচড় ভরে তুলচে আর মাঝে মাঝেসলজ্জভাবে আমাদের নৌকার দিকে চাইচে।

আরও খানিকদূর গেলাম, আবার সেই নির্জনতা, কোথাও লোক নেই, জন নেই, ঘর-বাড়ি নেই, শুধু মাথার ওপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়াচ্ছন্ন আকাশ আর নীচে সেই মাঠও গাছপালা দু-ধারে। বুড়ো ছকু মাঝি ছেলে সঙ্গে নিয়ে দুখানা ডিঙি দোয়াড়ি বোঝাইদিয়ে চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে যাচ্চে, তিন দিনে সেখানে নাকি পৌঁছুবে বললে। একদিকে ঘন সবুজ কাঁচা কষাড়ের বন, নীচু পাড়, জলের খানিকটা পর্যন্ত দাম-ঘাসে বোঝাই, কলমী শাক অজস্র, আর কলমীর দামে জলপিপি ও পানকোড়ী বসে আছে। মাথারওপরকার আকাশটা বেয়ে সবাইপুরের মাঠটার দিক থেকে খুব বড় এক ঝাঁক শাম্‌কুটপাখি বাসায় ফিরচে, বোধ হয় জটেমারির বিল থেকে ফিরলো, পাঁচপোতার বাঁওড়েযাবে। সেইখানটাতে আবার নলে মাঝি কাস্তে হাতে ঘাস কাটতে নামলো—কি অপরূপশোভা, সামনে খাব্‌রাপোতার ঘাটটা—একটা শিমুল গাছের পিছনে আকাশে পাটকিলেরঙের মেঘদ্বীপ, চারিধারে এক অপূর্ব শ্যামলতা, কি শ্রী, কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, কিঅপূর্ব আনন্দেই মন ভরিয়ে তোলে—নলে কাস্তে হাতে ঘাস কাটচে—কাঁচা কষাড়েরমিষ্ট,সরস, জোলো গন্ধ বার হচ্ছে, আমি শুধু হেলান দিয়ে বসে দূরের আকাশটা ওগাছপালার দিকে চেয়ে আছি।

জীবনটাকে উপভোগ করতে জানতে হয়। মাত্র আট আনা খরচ হল—তাই কি? তার বদলে আজ বৈকালে যে অপূর্ব সম্পদ পেলাম, তার দাম দেয় কে? আমাদের গ্রামের কেউ আসতো পয়সা খরচ করে খামোকা নৌকায় বেড়াতে? কেউ গ্রাহ্য করেএই অপরূপ বনশোভা, এই অস্তদিগন্তের ইন্দ্রজাল, এই পাখির দল, এই মোহিনীসন্ধ্যা?...কেউ না। এই যে সৌন্দর্যে দিশাহারা হয়ে পড়চি, মুগ্ধ, বিস্মিত, রোমাঞ্চিত হয়েউঠচি—এই সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা কেউ চোখ খুলে চায়?...আমি এসব করি বলে হয়তো আমাকে পাগল ভাবে।...

যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য-বোধ দিন দিন এত কমে যাচ্চে, সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়। শহর-বাজারের কথা বাদ দিলাম, এই সব পাড়াগাঁয়ে যেখানেআসল জাতিটা বাস করে, সেখানকার এই কুশ্রী জীবনযাত্রার প্রণালী, দৃষ্টির এইসংকীর্ণতা, এই শিল্পবোধের অভাব মনকে বড় পীড়া দেয়।

এবার জ্যোৎস্না উঠলো—আজ শুক্লা একাদশী, নলবন বাতাসে দুলচে, জ্যোৎস্নাপড়ে দুপাশের নদীজল চিক্‌-চিক্‌ করচে। ঘাসের আঁটি বেঁধে নিয়ে নলে মাঝি নৌকাছেড়ে দিল।

এত পাখি, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপর্ব সৌন্দর্য এ সব যেন আমারই জন্যেসৃষ্ট হয়েচে। এদেশেই তো এসব ছিল এতদিন, কেউ তো দেখেনি, কেউ তো ভোগকরেনি—কতকাল পরে আমি এদের বুঝলাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম—এই জ্যোৎস্না, এই আকাশ, এই অপূর্ব ইছামতীনদী আমারই জন্য তৈরি হয়েচে!

অনেক দিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এইরৌদ্রদীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু-ডাকা বনানী, উষ্ণমণ্ডলের এই অপূর্ব বন-সম্পদ, স্বচ্ছজলের মধ্যে সন্তরণশীল মৎস্যরাজি, নির্মেঘ নীল আকাশ—আমার শিরায় শিরায়কেমন একপ্রকার মাদকতার সৃষ্টি করল।

একটি ছেলের ছবি মনে এল—সে এমনি Tropics-এর শ্যামল সৌন্দর্য, রৌদ্রকরোজ্জ্বলা পৃথ্বী, নীল দিক্‌চক্রবালের উদার প্রখরতার মধ্যে এই জলধারা পানকরে, দিনরাত গায়ক পাখিদের কাকলি শুনে শৈশবে মানুষ হয়েছিল—গ্রামের কতদুঃখ-দারিদ্র্য, কত বেদনা, কত আনন্দ, কত আশা, কত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। সে মানুষহয়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছপালা, লতা, পাখি, ফুলফল, সূর্য—এদের, এরাই—তাকে কবি করেছিল।

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়েএলুম— তারপর গেলুম জটেমারির পুলটাতে। ঝিরঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর এক বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, এমন এক অপূর্ব আনন্দে মন ভরে উঠল, সারাগা এমন শিউরে উঠল—সে পুলকের, সে উল্লাসের তুলনা হয় না—গত কয়েকমাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ওরকম আনন্দ পাইনি।

আজ চলে যাবো, তাই বিদায় নিলুম—বিদায় জ্যাঠামশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইছামতী, আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না, আর দেখা হবে কিনা তাও জানি না, কিন্তু তোমার ফলে জলে পুষ্ট হয়েচি, তোমার অপরূপসৌন্দর্যে এমন স্বপ্ন-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিলে দশ বৎসরের বালকের চোখে, তোমারগাছপালার ছায়াতলে, তোমার পাখির কলকাকলিতে জীবন-নাট্যের অঙ্কশুরু, বিদায়, বিদায়—যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুলবো?...

মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্চে, হয়তো দু হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ঈজিপ্টে, যেখানে নলখাগড়ার বনে, শ্যামল নীল (Nile) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবদের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে আবার ষাটটিবছরের জন্যে এসেচি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই-বোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে? এই Cycle of Birth and Death যিনি নিয়ন্ত্রিত করচেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি—তিনিএক বড় শিল্পী। এই সকল জন্মের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙক্ষা হয়তো কোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়বে—সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা।

কে জানে যে আবার এ পৃথিবীতেই জন্মাবো। ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারিরমাথায় সবে উঠেচে—ওর চারি পাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘুরচে, তার জগতেযেতে পারি—বহু বছরের Globular cluster-দের জগতে যেতে পারি—কে বলবেএসব শুধুই কল্পনাবিলাস? এ যে হয় না তা কে জানে? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব।

—বৃহত্তর জীবন-চক্র যুগে যুগে কোন্ অদৃশ্য দেবতার হাতে এ ভাবেই আবর্তিত হচ্চে।

শত শত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ—জয় হউক সে দেবতার, তাঁরগতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ময় হউক, নিত্যসৃষ্টিজায়মান হউক—তাঁর প্রাণ-চক্রের নিত্য আবর্তনশীল বিশাল পরিধিতে।

গুনগুন করে বানিয়ে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল:—

‘গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে।

হে অজানা অনন্ত—’

নিজেকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড়দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় স্রষ্টা।

হঠাৎ সারা দেহ এক অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠল—ওপারে মাধবপুরের বটগাছের সারি, বেলেডাঙার গ্রামের বেণুবনশীর্ষ সান্ধ্য বাতাসে দুলচে, আউশধানের ক্ষেতেরআইল-পথ বেয়ে কৃষক-বধূ মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসচে, আইনদ্দি মোড়লেরবাড়ির মাথায় শুক্রতারা উঠেচে—মনে হল আমি দীন নয়, দুঃখী নয়, ক্ষুদ্র নয়, মোহগ্রস্ত জড়মানব নয়, আমি জন্ম-জন্মান্তরের পথিক-আত্মা। দূর থেকে কোন্ সুদূরে নিত্যনূতন পথহীন পথে আমার গতি—এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, এই সহস্র সহস্র শতাব্দী—আমার পায়ে চলার পথ, নিঃসীম শূন্য বেয়ে সে গতি আমার ও সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হোক।

মনে হল আর এক আজন্ম পথিক-দেবতার কথা, তাঁর কথা আমার এক খাতায়লিখেচি। আমার সে কল্পনা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার দৃষ্টিতে আমি তা দেখেচি, আমার কাছে সেটা মহাসত্য—revealation, চিন্তা ও কল্পনার আলোকে যা দেখা যায়—তাকে আমি মিথ্যা বলে ভাবতে পারি না।

বিদায় বিদায়—আর কখনো অজয়ের সঙ্গে দেখা হল না, গুরুজীর সঙ্গে দেখা হল না,কথক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল না, দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হল না—অনেকদিন পরেঅজয়ের সেই শৈশবে-শোনা গানটা যেন কোথায় বসে গাচ্চে মনে পড়ে।

‘চরণ বৈ মধু বিন্দতি’—চলা-দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।

দেশে থেকে এসে আজ একেবারেই ভাল লাগচে না। বৈকালগুলির জন্যে মনকেমন করচে, কুঠীর মাঠের জন্যে, খুকীর জন্যে, ইছামতীর জন্যে, ফণিকাকার জন্যে—সকলের জন্যেই মন কেমন হয়েচে। ছেলেবেলায় দেশ থেকে বোর্ডিং-এ ফিরলেএমনটি হত, অনেক কাল পরে মানস ইতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

কাল কলকাতাটা যেন নতুন নতুন লাগছিল—যেন এ কোন্ শহর—এর কর্মব্যস্ত চেহারাতে আমিই কেমন অবাক হয়ে গেলাম, আনন্দবাজার পত্রিকার ওই গলিটি, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট সব তাতেই লোকে একটা কিছু করচে—ব্যস্ত, ক্ষিপ্র, ছুটছে, বাস থেকে নামচে—দেশের মানুষদের যে মৃতের মত জড়তা, অলস ও কর্মকুণ্ঠতারপরে এসব যেন নতুন লাগল।

দিনটি কাটল বেশ ভালোই। সকলে উঠে সজনীর সঙ্গে গেলুম কাঁচরাপাড়া, সেখানথেকে বড়-জাগুলে হয়ে মরিচা। এত ঘন বন যে কলকাতার এত কাছে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না। সেখানে গিয়ে ঔষধ সংগ্রহ করে কাঁচরাপাড়ায় এলাম। বাস রিজার্ভ করে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আসা গেল কাঁচরাপাড়ামাঠের মধ্য দিয়ে মোহিত মজুমদারের কাছে। মোহিতবাবু শোনা গেল শা’গঞ্জ গিয়েচেন। কাঁচরাপাড়া বাজারে একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে বাসে করে এলুম হালিসহরখেয়াঘাটে। এই ঘাটে অনেকদিন আগে দিদিমা থাকতে একবার সর্বপ্রথম এসেছিলুম, কেওটা হালিসহরে থাকতে।

মোহিতবাবুর ওখানে খাওয়া-দাওয়া হল, অনেকক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ করে বর্তমান তরুণ-সাহিত্য সম্বন্ধে কথাবার্তা হল। ভদ্রলোক প্রকৃত কবি, সাহিত্যই দেখলুম ওঁর প্রাণ, কবিতা পড়তে বসে যখন ছেলেমেয়েরা তাঁর কোল থেকে টানাটানি করেরসগোল্লা খেতে লাগল—তখন সে কি দৃশ্যই হল!

বেরিয়ে আমি আর মোহিতবাবু কেওটায় প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় খুঁজতে খুঁজতে গেলুম। সে জায়গাটা এখন একটা পোড়ো ভিটে ও জঙ্গল—কোণের সে জামরুল গাছটা এখনও আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জামরুল গাছটা চেনা যাচ্ছিল না—মোহিতবাবু কাছে গিয়ে বললেন—হ্যাঁ,এটা জামরুল গাছই বটে। জামরুল পেকেআছে।

তারপর রাখাল চক্রবর্তীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলুম। পুলিন তাঁর ছেলে। ছেলেবেলায়আমরা এক সঙ্গে বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় পড়েচি—এখন ও হট্‌পা লম্বা, কালোগোপ-দাড়িওয়ালা মানুষ। ওর সঙ্গে কথা বললুম প্রায় ত্রিশ বছর পরে। শেষ কবে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কে জানে?...

রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতরের বোয়াক দিয়ে ওদের রান্নাঘরের রোয়াকে বসে মাসিমার সঙ্গে কথা বললুম। শেষ কবে কথা বলেছিলাম, কবে ওদের রোয়াকে পা দিয়েছিলাম, হয়তো তখন আমরা কেওটাতে ছিলাম—তারপর হয়তো শীতলের মায়েরগল্প বলা, কি আতুরীর কাছে ধামা-কুলো বেচার ঘটনাটা—যা আমার কেওটা সম্পর্কেমনে আছে, ঘটেছিল। তারপরে এক বিরাট আনন্দ, আলাপ, রহস্য, উল্লাস, দুঃখ, হর্ষ, শোক, আলোক-পূর্ণ—বিরাট জীবন কেটেচে—পটপটি তলার মেলায়, বকুলতলার দিনগুলোতে, পুব-মুখো যাওয়ায়, ইছামতীর ধারের সে অপূর্ব শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি—সেই কতদিন স্কুল থেকে সপ্তাহ পরে ফিরে এসে মায়ের হাতে চৈত্র মাসের দিনে বেলের পানা খাওয়া, তারপর স্কুল কলেজ, বাইরের জীবনে যা কিছু ঘটেচে সবই ওর পরে। কালকার দিনটিতে আবার এতকাল পরে পা দিলাম রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতরকার বোয়াকে বা পুলিনের সঙ্গে কথা কইলাম।

জীবনের অপূর্ব এই সব মুহূর্তে কি অদ্ভুত, অপরূপ ভাবেই ধরা পড়ে যায়।

করুণা মামার বাবা যোগীনবাবু জানলা খুলে কথা কইলেন। তিনি আমাকে খুব চেনেন দেখলাম।

রাত আটটার বাসে হুগলী ঘাট এলাম। খুব পরিষ্কার আকাশ, খুব নক্ষত্র উঠেচে।রাত এগারোটায় কলকাতা ফেরা গেল।

সেই সকাল ছ'টায় বেরিয়ে কোথায় বড়-জাগুলে, মরিচা, দুধারের ঘন জঙ্গল, কাঁচরাপাড়া বাজার, বাঁশের পুল, হালিসহরের খেয়াঘাট কেওটা, হুগলী ঘাট, নৈহাটী—সব বেড়িয়ে ঘুরে আবার কলকাতা ফিরলাম সাড়ে এগারোটা রাত্রে। মোটর বাস্ ছিল বলেই একদিনে এত ঘোরাঘুরি, এমন সব অপূর্ব অভিজ্ঞতা সম্ভব হল।

রাখাল চক্রবর্তীর বাড়ির পৈঠায় বসে মোহিতবাবু 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কেওটায় সেই অশ্বত্থ গাছটার কাছে রাত আটটার সময় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সাহিত্যমণ্ডলী গঠনের ও 'শনিবারের চিঠি' অন্যভাবে বার করার জন্য খানিকটা পরামর্শ করা হল। কাজে কতদূর হয় বলা যায় না।

কাল মোহিতবাবু কলকাতায় এসেচেন, সজনীবাবু লিখে পাঠালেন। বৈকালে গেলামপ্রবাসী আপিসে। সেখান থেকে বার হয়ে সকলে মিলে প্রথমে যাওয়া গেল ডঃ সুশীল দে-র বাড়ি। সেখানে ঢাকার বর্তমান হাঙ্গামা ও ইউনিভার্সিটির গোলযোগ সম্বন্ধেঅনেক কথাবার্তা হল। সজনীবাবুর ব্যক্তিগত কথাও অনেক উঠল—অনেকক্ষণ বসেসেখানে হাসি-গল্প হল, বেশ উপভোগ করা গেল—ডঃ দে আমার ঠিকানা চাইলে বিপদে পড়লুম—এ বাসাটা যদি বদলাই তবে, বদলে ফেললে এ ঠিকানাটা দিয়েই বা লাভ কি?

সেখান থেকে বার হয়ে সবাই গেলাম কবি যতীন বাগচীর বাড়ি। মনোহরপুকুর রোড তো প্রথমে খুঁজেই বার করা দায়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউ বেয়ে আমরা রাত নটার সময় একবার এদিক, একবার ওদিক—সে মহামুস্কিল। অনেককষ্টে রাত দশটার সময় বাড়ি বেরুল। যতীনবাবু আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন।মোহিতবাবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বললেন, 'অল্পদিনের মধ্যেই ইনিযশস্বী হয়ে উঠেছেন একখানা বই লিখে, luck আছে বলতে হবে।' আমি মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠলাম, যা-ই বলি। তারপর জলটল খাওয়ার পরে সেখান থেকেঅনেক রাত্রে বাসায় ফেরা গেল।

আজও আবার তাই। প্রথমে কেদারবাবুর সঙ্গে এশিয়াটিকদের অকর্মণ্যতা নিয়েখানিক তর্ক-বিতর্ক হল। উনি বললেন, 'কেন, জঙ্গিস্ খাঁ কি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি?'আমি বললুম—সেটা one man show মাত্র, কোনো স্থায়ী সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন কি?...প্রবাসী আপিস থেকে আমরা গেলুম অমল হোমের বাড়ি, সেখানে

অনেকক্ষণ গল্পগুজব ও কবিতা আবৃত্তি হল। অমল হোমের স্ত্রী বললেন, 'একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, আপনার 'অপরাজিত' পড়ে—আমি তাকে ডাকি,—কালোর ঘরেই আছেন'।

মেয়রের নির্বাচন সম্পর্কে অনেকগুলো নতুন কথা শুনলাম অমল হোমের মুখে—যতীন সেনগুপ্ত এবার মেয়র না হলে অনেকে দুঃখিত হবে বটে, কিন্তু মেয়র হলেলোকে তার চেয়েও দুঃখিত হবে। বাইরে চেয়ে দেখলাম আকাশে মেঘ করেচে—অনেকটা দূরের আকাশও দেখা যায়—দূরের কথা, দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এঁরাবেশ শিক্ষিতা মেয়ে, ধরন-ধারণ এত মার্জিত ও মধুর যে এঁদের সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের —সইমা কি বুড়ি পিসিমা—এদের তুলনা করে হতাশ হতে হয়। একটা ভাঙা কড়াএক জায়গায় বসানো ছিল, বেরুবার সময় পায়ে এমন লাগল!....

সেখান থেকে এলাম সুরেশবাবুর বাড়ি। সেখানে হেম বাগচী ও সুবল বসে আছে। সুরেশবাবুর স্ত্রী চায়ের উদ্যোগ করতে আমরা নিবৃত্ত করলাম—কেননা এইমাত্র অমল হোমের বাড়ি থেকে আমরা চা, পাঁপর ভাজা, বাদাম ভাজা ও রসগোল্লা খেয়ে আসচি। ফরাসী কবি বোদ্‌লেয়ার সম্বন্ধে কথাবার্তা হল, মোহিতবাবু একটা লেখা পড়লেন—তারপর আমরা সবাই এলাম চলে। মোহিতবাবুর আবৃত্তি কি সুন্দর!

কি সুন্দর সন্ধ্যাটা কাটল!

আজ সকালে ধূর্জটিবাবু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে গল্পগুজবের পর আসাম মেলে রাণাঘাট এলাম ও সেখান থেকে সাড়ে তিনটার ট্রেনে দেশে এলাম। হাজারির মোটরটা দাঁড়িয়ে ছিল, সহজেই বাজার পর্যন্ত আসা গেল।

এসেই কাপড়-চোপড় ছেড়ে গামছা নিয়ে নদীতে গা ধোবার জন্য গেলাম। ভারি সুন্দর বৈকাল, আকাশের রঙ এমন সুন্দর শুধু বর্ষাকালেই হয়। গাছপালার রঙ কি সবুজ—রৌদ্রের রঙটা কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের, কুঠীর মাঠে গেলাম—সেইশিমুলগাছটার গায়ে কি সুন্দর রৌদ্রই পড়েচে—চারি ধারে আকাশের রঙে বড় মুগ্ধকরলে।

আমাদের ভিটার পাশে যে গাছটা আছে, তার গায়ে খানিকটা হলদে রঙের রোদলেগে দেখতে হয়েচে অদ্ভুত।

মাঠের চারিধারে সবুজ গাছপালা, আউশ ধানের সবুজ ক্ষেত, সুনীল আকাশ, এখনও বৌ-কথা-ক' ডাকচে—খুব ডাকচে। সোঁদালি ফুল এখনও কিছু কিছু আছে।

কাল বৈকালে প্রথম গেলাম সুবলবাবুদের বাড়ি বাগবাজারে, সেখানে খানিকক্ষণগল্পগুজবের পরে বিভূতিদের ওখানে গেলাম। বাগবাজার ট্রামে আসবার সময়ে মনে ভাবছিলাম সাতাশ বছর আগে এই বর্ষাকালে, তবে বোধহয় এর আরও কিছু পরে—এই জায়গাটি দিয়ে ট্রামে করে যেতুম বাবার সঙ্গে। তখন আমি নিতান্ত বালক, আর আজ কেবলই মনে হচ্চে এই সময়ের পরে কলকাতা ছেড়ে দেশে গিয়ে সে কি অপূর্ব জীবন-যাত্রা। কি বৈচিত্র্য! সে শুধু অনুভূতিতে ভরা—নানা ধরনের বিচিত্র বাল্য অনুভূতি!..আসল জীবনটাই তো হল এই অনুভূতি নিয়ে, পুলক নিয়ে, উচ্ছ্বাস নিয়ে। আজও সেইগ্রাম আছে, নদী আছে, কিন্তু সে অপূর্ব অনুভূতি আর নেই।

বিভূতিদের বাড়ি থেকে যখন আসি তখনও কেমন একটা শূন্যতার ভাব, যেন এদেরবাড়ির সকলেই আছে—অথচ কি যেন নেই। সবাই কাছে এল, বসলে, গল্পগুজবকরলে—কিন্তু কোথায় সেই ভাদ্রমাসের বৈঠকখানা ঘরের দিনগুলো, সেই মক্কা-মদিনা যাত্রী তাকিয়া-বালিশ, সে আনন্দের ঢেউ? Where is that child?...সিধুবাবুও নেই—কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা।

পথে একটা মারামারি হচ্ছিল, পিকেটিং-কারী এক বালককে নাকি পুলিসে খুবমেরেচে, তাই নিয়ে। বাসে করে বায়োস্কোপ দেখতে গেলাম ও সেখান থেকে অনেক রাত্রে এলাম ফিরে।

আজ রবিবাসরের অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে রাজশেখরবাবুরসঙ্গে আলাপ হল, 'অপরাজিত' তাঁর খুব ভাল লেগেচে বলছিলেন।

আজ ক'দিন থেকে মনে কেমন একটা অপূর্ব ধরনের আনন্দ পাচ্ছি তা বলবার নয়, লিখে প্রকাশ করবার নয়—সে শুধুবুঝতে পারি—বোঝাতে পারি নে।

এইমাত্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দাটাতে একা বসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আকাশেরদু'একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে এই অপূর্ব ভাবটাই মনে আসছিল...আনন্দ মানুষকে এত উচ্চেও ওঠাতে পারে। অমৃত বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে, সত্যবলে মনে হচ্ছিল, বিরাট ও শাশ্বত বলে মনে হচ্ছিল...এক উন্মাদনাময়ী প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি।...মুগ্ধ হয়েগেলাম...

দু-একটা চরণ গান তৈরি করে গুনগুনকরে গাইলাম:—

মনে আমার রঙ ধরেচে আবার সুরের আসা-যাওয়া,—

আজ ক'দিন থেকেই এরকমটা হচ্ছে।

দিনগুলো যে ভয়ানক নিরানন্দ হয়ে উঠেচে একথায় কোনো ভুল নেই। এ শুধুহয়েচে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ভয়ানক খাটুনির জন্যে। অনবরত পরের খাটুনি, নিজের জন্য এতটুকু ভাববার অবকাশ নেই, অবসর নেই, সকাল দশটা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা। মনের অবকাশ মানুষের জীবনের যে কত দরকারীজিনিস তা এই কর্মব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত কর্মঠ, হিসাবী ও সময়জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরাকিছু বুঝবে কি? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়,ভাল গাড়ি-ঘোড়া চড়ায়—অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে আরও জাগিয়ে নাচিয়ে তোলে—শক্ত করেবাঁচিয়ে রাখে, বেশ সুষ্ঠুভাবে ও কৃতীর সুনামে বাঁচিয়ে রাখে—কিন্তু ভারবাহী চোখে-ঠুলি বলদের থেকে কোনো পার্থক্যের গণ্ডী টেনে দেয় না—জীবনকে মরুভূমি করেরেখে দেয়,—টাকার গাছের আবাদ। প্রকৃতির শ্যামল বন্য সম্ভার, নীল আকাশ, পাখিরকূজন, নদীর কল মর্মর, অস্ত-দিগন্তের সান্ধ্যমায়া—এ সব থেকে বহুদূরে, এক জনহীন, জলহীন, বৃক্ষলতাহীন মরু। এদের দেশ-ভ্রমণেও যেতে দেখেচি ফার্স্টক্লাস কামরায়চেপে, দশদিনের ভ্রমণে দুই হাজার টাকা ব্যয় করে, মোটরে করে যাবতীয় স্থান একনিশ্বাসে বেড়িয়ে, বিলাতী হোটেলে খানা খেয়ে, হুইস্কি টেনে—সেও ঐ ভেড়ার দলেরমত বেড়ানো।

আজ বসে বসে শুধু মনে হচ্ছিল অনেকদিন আগে বাল্যের নবীন মধুর বর্ষারবৈকালগুলি—কি ছায়া পড়তো, কি পত্রপুষ্পের সুগন্ধ বেরুতো, কি পাখির গান হত—জীবনের সম্পদ হল সে সব—এক মুহূর্তে জীবনকে বাড়িয়ে তোলে, বৃদ্ধিশীল করে—আত্মার পুষ্টি ওখানে। ধ্যান অথাৎ contemplation চাই, আনন্দের অবকাশচাই—তবে হল আত্মার পুষ্টি—টাকা রোজগারের ব্যস্ততায় দিনরাত কাটিয়ে দেওয়ায়নয়।

মানুষের জীবনে প্রকৃতি একটি মহাসম্পদ, এর সঙ্গে অসহযোগ করলে জীবনটায়প্রসারতা কমে যায়, রোমান্স কমে যায়, common place হয়ে পড়ে নিতান্ত।

আমি নিজেই বুঝতে পারি, এই ভাদ্র মাসের ঠিক এই সময়কার ১৯২৭ সালের ডায়েরীগুলো যদি পড়া যায় তবেই দুই জীবনের আকাশ-পাতাল তফাতটা ভালো করে বোঝা যাবে।

১৯২৫ সালে এই সময়ে বিভূতিকে পড়াতুম মনে আছে, সে এখন কত বড় হয়ে গিয়েচে—এখন আবার অন্য ছেলেদের পড়াই ঠিক এই সময়টিতে, সে-কথা হলআজ। এদের এখানে প্যাক-বাক্সের গন্ধ, ছেলেগুলোও দুষ্টু।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিলুম। একদিন উপেনবাবুকে বলেছিলুম, বাল্যের অমুক দিনটা থেকে যদি জীবন আবার আরম্ভ হত...? আজও তাই ভাবি—জীবনের experience আমাদের খুব বেশি নয়—সমৃদ্ধ খুব, একথা

বলিতে পারি নাঅন্য অনেকের জীবনের তুলনায়। সামান্য একটু ভাগলপুর যাওয়া, সামান্য এক আবেষ্টনী, নতুন ধরনের জীবনের স্পর্শ, বড়লোকের বাড়ি—এই সব। কিন্তু এতেই আনন্দ এত বেশি দিয়েচে যে, এ থেকে এই কথাটাই বার বার মনে হয় যে নির্দিষ্ট পরিমাণের আনন্দপ্রত্যেকের মনেই ভগবান দিয়েচেন, যে কোন জিনিসকে উপলক্ষ করেহোক সেটাব্যয়িত হবেই হবে।

অনন্ত জীবনে আরও কত অভিজ্ঞতা হবে, সেই কথাই ভাবি। আরও কত উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা, কত অপূর্ব আনন্দের বার্তা!

এ রবিবার দিনটাও একটা ট্রামের সারাদিনের টিকিট বন্ধুর ছেলে তরুকে দিয়ে কিনিয়ে আনালুম শিয়ালদহ থেকে। এদিন বেরোলুম সকাল সাড়ে ছ'টার সময়ে।প্রথমে উপেনবাবুর বাসা। সেখান থেকে গেলাম ভবানীপুর সোমনাথবাবুর বাড়িতে। খানিকটা গল্পগুজব করার পরে গেলাম প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি বালিগঞ্জে। তিনি আমার বইখানা পড়ে খুব খুশি হয়ে আমার সঙ্গে পরিচিত হবার ঔৎসুক্য জানিয়েছিলেন, এ কথা সোমনাথবাবু আমাকে লেখেন—তাই এ যাওয়া। তিনি নাকি বলেচেন—In Europe, he could have been a celebrity; কিন্তু এখানে কে খাতির করবে?... তারপর আমার বইখানা সম্বন্ধে প্রমথবাবু নানা কথা বললেন—দেখলাম বইখানি খুবভাল করে পড়েচেন। দুর্গার সিন্দূর-কৌটা চুরি ও সেটা কলসী থেকে বেরুনোর উল্লেখটাবার বার করলেন।

সোমনাথবাবু আমাকে এসে পার্ক সার্কাসে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন—বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে একটা ভারি লাভ হল বলে মনে করচি'।

ওখান থেকে এসে গেলাম রেবতীবাবুদের মেসে—খানিকটা গল্পগুজব করার পরে গেলাম নন্দরাম সেনের গলি ও বাগবাজারে। তারপর হরি ঘোষের স্ট্রীটে কালোদের বাসাতে। দুপুর তখন দুটো, বাইরের ঘরে বুড়ো ছিল, খিনুও এখানে আছে দেখলাম—খিনু কাছে এসে বসলো, অনেক গল্পগুজব করলে। কালোর ছেলে এনে দেখালে। ঠিকযেন মায়ের পেটের বোনের মতো সরল ব্যবহার করলে। ভারি আনন্দ হলো দেখে।ওরা সবাই এল—শরবত করে আনলে খিনু—ভারি ভাল লাগল।

ওখান থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে দক্ষিণাবাবুর বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্পগুজবের পর জলযোগ হল। চা-পানের পর সেখান থেকে বার হয়ে নিকটেই মহিম হালদার স্ট্রীটে রবিবাসরের অধিবেশনে যোগ দিলাম—সেখানে বেলা পাঁচটা থেকে রাত ন'টা। অনেক রাত্রে ট্রামে বাসায় ফিরলাম।

আজকাল সেই মধুর দিনগুলি হারিয়ে গেছে—বহুদিন দেশে যাইনি—আজ বিকেলেস্কুলবাড়ির ছাদ থেকে বহুদূরের দিকে চেয়ে কতকাল আগের কথা মনে হচ্চিল—মনেহচ্চিল অনেককাল আগের সেই মাকাল ফল, পট্‌পটি গাছের সময়টা এই—কত নতুন লতাপাতা গজিয়েচে—ভাদ্র দুপুরের খররৌদ্রে জানালার ধারে বসে সে-সব মধুর জীবন-যাত্রার দিনগুলি—কত সুখদুঃখ-ভরা শৈশবের সে জগৎটা।...কোথায় কতদূরে যে চলে গিয়েচে! আজকাল সময় পাই না, স্কুলের পরই পর পর দুটো ছেলে পড়ানো—একটুখানি ভাববার সময় পাইনে, দেখবার সময় পাই নে, তবু যতটুকু সময় পাই—দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় হাঁ করে যেন আকাশটার দিকে চেয়ে একটুখানি অপরাহ্ণকে স্কুলের তেতলার ছাদটা থেকে দেখি—আবার সেই 'জীবন সন্ধ্যা' ও 'মাধবী কঙ্কণে'-এরদিনগুলি আগতপ্রায়। এখন দেশে পাটের আঁটি কাচবে, খুব পাঁকাটি পড়ে থাকবে। সেইজেলেখা, রঙমহাল শিসমহাল, শিবাজীর দিনগুলি আরম্ভ হবে। এই যে অভাব, নাদেখতে পাওয়া—আমাদের মনে হয় এই ভাল। এতে মনের তেজ খুব বাড়ে, দৃষ্টির intensity আরও বেশি হয় এটা বেশ বুঝি।

একটা কথা এই মাত্র ভাবছিলাম, রামায়ণ মহাভারতের যুগের পূর্বে ভারতেরবালকেরা, বৃদ্ধেরা কি ভাবতো—তখন জীবনের ভাব-সম্পদ ছিল দীন—সীতার অশ্রুজলতখন ছিল লোকের অজ্ঞাত, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের

লীলা, এ সব তো জানতো না। বুদ্ধের কথা বাদ দিলাম, অশোক, চৈতন্য, মোগল বাদশাহ্‌গণ—এই সমস্ত Tragic possibility, ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল লীন—তবে তখনকার লোকে কি ভাবতো,—কবিদের, ভাবুকের, গায়কের, চিত্রকরের উপজীব্য ছিল কী?

আর পাঁচশত বছরের সম্ভাব্যতার কথা মনে উঠচে। আরও কত Tragedy-র বিষয়, ভাবুকতার ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এর মধ্যে। সেটা এখনই গড়েউঠচে, কিন্তু আমরা তার সমস্তটা এক সঙ্গে দেখতে পাচ্চি নে। এই ইংরাজ চলে যাবেএকদিন—এই সব স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই গান্ধী, নেহরু, চিত্তরঞ্জন, এই নারী-জাগরণ, কাঁথির এই অশ্রুতীর্থ—ইতিহাসে এসব কথা নব নব ভাবের জন্মদাত্রী হবে। এসবঘটনা জাতির মনের মহাফেজখানায় অক্ষয় আসনের প্রতিষ্ঠা করবে।

কাল সারা দিনটা বড় ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটল—প্রবাসী আপিসে একটা কাজছিল। ঠিক বেলা বারোটার সময় সেখান থেকে বার হয়ে গেলাম প্রেসিডেন্সী কলেজেরবীন্দ্রপরিষদে। নীহারবাবু বললেন, 'পথের পাঁচালী'কে আমি তরুণ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ আসন দিই। প্রমথবাবু আবার বইখানির কথা অনেক ছাত্রদের বলছিলেন। প্রতুল গুপ্ত বলে ছেলেটি বঙ্গ-সাহিত্যের বিজয়ী সেনাপতি বলে অভ্যর্থনা করলে। সোমনাথবাবুবললেন, 'আপনি বর্তমান আধুনিকতম সাহিত্যের বড় ঔপন্যাসিক—আপনাকেও কিছুবলতে হবে'। খুব আনন্দে কাটল।

ওখান থেকে বার হয়ে যাবার কথা ছিল সাহিত্য-সেবক-সমিতির অধিবেশনে, কিন্তুতা আর যাওয়া সম্ভব হল না। প্রমথবাবুর সঙ্গে গল্প করতেই বেজে গেল ন'টা। অতুলগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন—তিনি আমার বইখানার খুব প্রশংসা করলেন। তিনি আমারশিক্ষক ছিলেন ল' কলেজে। তাকে বললুম সে-কথা।

আজ একবার দুপুরে কাজে গিয়েছিলাম অক্ষয়বাবুদের বাড়িতে। শীতল একখানা হাতের লেখা মাসিক পত্র বার করচে, তাতে লেখা দিতে বলচে। কাল সে আসবে বেলাতিনটের সময়।

সেখান থেকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে ফিরছিলুম—বৈকাল ছ'টা। পূর্বদিকে আকাশ অন্ধকার হয়ে আসচে। শিয়ালদহের কাছটায় ট্রামটা এলেই আজকাল পূর্বদিকে চাই।অন্যদিনও চাই, এমন হয় না—আজ যে কী অপূর্ব মনে হল।...মাকাল ফল, পিসিমা, পুরনো বঙ্গবাসী, দুপুরের রৌদ্র, মাকাল গাছ, ঘুঘু পাখি, বাঁশবন—কত কথা যে এক মুহূর্তে মনে এল! আমি এরকম আনন্দ একদিন মাত্র পেয়েছিলাম,—সেদিনটা স্কুলের ছাদ থেকে বহুদূরের আকাশটার দিকে চেয়েছিলাম এই সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে।

তার পরে সুরি লেনের কাছে নেমে গেলাম রাজকৃষ্ণদের বাড়ি যাব বলে।

আমি শুধু প্রার্থনা করি, আমাকে আগে নিয়ে চল হে ভগবান—যাতে সর্বদা মন গতিশীল থাকে। কিসে মন বর্ধিত হয়, আনন্দ বর্ধিত হয়, তার সন্ধান তোমার জানা আছে, আমাদের নেই—তা ছাড়া আমার শিল্পী মন কি করে আরও পরিপুষ্ট হবে তারসন্ধান তুমিই জানো।

তোমার যে দিকে ইচ্ছা সে দিকেই নিয়ে যেও।

অবশেষে ঘুরিয়া যাওয়াই ঠিক করে কালকার বম্বে মেলে বার হয়ে পড়া গেল।দিনটা ছিল খুব ভাল—বৈকালের দিকে ট্রেনটা ছাড়ল—বর্ষাশেষে বাংলার এ অংশটারশ্যামল-শ্রী দেখে বুঝতে পারলাম বাংলা বাংলা করি বটে, কিন্তু দেশের সমগ্র পরিপূর্ণতাকে কখনো উপভোগ করিনি—কী অপূর্ব অস্ত-আকাশের রঙীন মেঘস্তূপ, কী অপরূপসন্ধ্যার শ্যামছায়া! ...কোলাঘাটের যে এমন রূপ, তা এর আগে কে ভেবেছিল? পিছন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দেশের ভিটা সেদিন দেখে এসেচি, তারই কথা মনে হল—সেই ঝিক্‌রে গাছগুলো সন্ধ্যার ছায়ায় বাল্যের আনন্দ-ভরা এক অপরাহ্ণের ছায়াপাতে মধুর হয়ে উঠেচে এতক্ষণ—এই তো পূজার সময়, বাবা এতদিন বাড়ি এসেচেন, আমাদের পূজার কাপড়

কেনা হয়ে গিয়েচে এতদিন—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রির উৎসবের সে সব আনন্দ—কি জানি কেন এই সব সময়েই তা বেশি করে মনে আসে।

সব সময় এই দেশের ভিটার ছবিটাই মনে উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেরণা দেয়—এ অতি অদ্ভুত ইতিহাস।

বিলাসপুর নেমে ঝড় বৃষ্টি। এখন একটু রৌদ্র উঠেচে—গাড়ির মধ্যে বসে বসেলিখচি—কিন্তু মেঘের ঘোর এখনও কাটেনি।

পরশু বৈকালটি সজনীবাবু, সুবলবাবু ও গোপালবাবুর সঙ্গে বেশ কেটেচে। প্রথমেরেস্টুরেন্টে কিছু খেয়ে মোটরে করে গেলাম লেকে—সেখান থেকে আউট্রাম ঘাট—সেখানে চা-পানের পর বাসা। ডঃ সুশীল দে-র ওখানেও ঘণ্টা তিন-চার গল্প করে ভারিআনন্দ হল।

কারগী রোড়ে পৌঁছে দেখলাম কিছুই আসেনি, অতি বর্ষণের ফলে বন্যা হওয়াতেরাস্তা ভেঙে গিয়েচে—গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে দুই-তিন দিন লাগবে—আরও একটিসাহেব আমারই মত বিপন্ন হয়ে পড়েচেন—সুতরাং প্রত্যাবর্তনই যুক্তিযুক্ত মনে হল।একজন বাঙালী ওভারসিয়ার ছিলেন, তাঁর নাম সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য—তিনি সঙ্গে করেতার বাসায় নিয়ে গেলেন—বেশ লোক। ঝিঙে ও ঢেঁড়স ভাজা, ডাল ও ভাত।

ওধারকার রাঙা মাটির দেওয়াল, বেশ দেখতে। মনে হল ওরকম বাড়িতে আমি তো একেবারেই টিকতে পারবো না। সঙ্গে করে দেখালেন, পাশেই জমি কিনেচেন— সেখানে তরকারীর বাগান। একটি গালার কারখানায় নিয়ে গেলেন গালা চোলাই হচ্চে—একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। সেখান থেকে এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে সামনেরপাহাড়টাতে ওঠা গেল। ওপারে আর একটা পাহাড়—মধ্যে ঘন শাল পলাশের বন—মহিষের গলায় একটানা ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্চে। ওখানকার একজন খ্রীস্টান ডাক্তারজানপান্নার বিবাহ গেল সেদিন, বিবাহ উপলক্ষে অনেকগুলি সাহেব, মেম ও বাঙালী খ্রীস্টান মেয়ে এসেছিলেন—এই ট্রেনে যাচ্চেন।

বিলাসপুরে গাড়ি পেয়ে গেলাম ঠিক মত—ভিড় খুব বেশি ছিল না। বিলাসপুরেরও রায়গড়ের মধ্যেকার আরণ্য ভূভাগের দৃশ্য অতি অপূর্ব—কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে নামবার পরেই অধিকতর অপরূপ এমন আর এক বনভূমির ভিতরদিয়ে ট্রেন যেতে লাগল, যার তুলনায় পূর্বে যতগুলো দেখেচি সব ছোট হয়ে গেল, তুচ্ছহয়ে গেল—সেটা হচ্চে রায়গড় ও ঝারসাগুদার মধ্যে—সে অপরূপ আরণ্যভূমিরবর্ণনা চলে না। দিবাশেষের ঘন ছায়ার অনতিস্পষ্ট সে দৃশ্যের মত গভীর অন্য কোনোদৃশ্য জীবনে দেখিনি কখনও—চন্দ্রনাথের পাহাড়ও নয়। কি প্রকাণ্ড পাহাড়টাই বরাবরসঙ্গে সঙ্গে একেবারে চক্রধরপুর পর্যন্ত এলো! ...মাঝে মাঝে সাদা মেঘগুলো পাহাড়েরগায়ে লেগে আছে, যেন কুমোরেরা পণপুড়ুচ্চে—নীল মেঘের মত পাহাড়টার শোভাই বা কি! লোকে ভেবে দেখে না, মনের সতর্কতা কম, তাই সেদিন সেই লোকটা বললে, 'মশাই এ অঞ্চলে সবই barren'...barren কোথায়? তারা কি চক্রধরপুরের পরেরএই গম্ভীর-দৃশ্য বনানী দেখেনি?...

আমি মনে মনে বুঝে নিলাম পিছনের ওই নীল পাহাড়টা, মেঘরাজি যার কোলে—সন্ধ্যাবেলাতে দুষ্টু ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়েচে—ওটা আর রেলের পিছনে মাঠগুলোনিয়ে একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজ তৈরি হয়েচে—দেড়শত দুইশত বর্গ মাইল পরিমাণের এইত্রিভুজটায় সবটাই বসতিবিরল, স্থানে স্থানে একেবারে জনহীন অরণ্য, পিছনে বরাবরওই পাহাড়টা। এই আরণ্যভূমির ও শৈলমালার মধ্য দিয়ে রেলপথটা চলে গিয়েচে।সহসা একটা পাহাড়ের মেঘে ও কুয়াশায় ঢাকা শিখরদেশের কি অদৃষ্টপূর্ব শোভা।...গাড়ির সবাই বললে—দ্যাখো, দ্যাখো—আমার তো হৃদয় বিস্ফারিত হল, চারিধারেএই অপূর্ব বনভূমির শোভা দেখে অন্ধকার পর্বত-সানুস্থিত অরণ্যের মধ্যে কোথা থেকেসদ্য-ফোটা শেফালি ফুলের সুবাস পেলাম—ট্রেনটাও Rock cuttingটা ভেদ করেঝড়ের বেগে ছুটেচে—চারিধারে রহস্যাবৃত অন্ধকারে ঢাকা সেই শৈলপ্রস্থ ও অরণ্য-ভূভাগ—জীবনে এ ধরনের দৃশ্য ক'টাই বা দেখেচি! ...রাত

আটটায় এসে বম্বে মেল ঝারসাগুদাতে দাঁড়াল। এখানে চা ও খাবার খেয়ে নিলাম। সেদিনকার মত উদার-হৃদয় সহচর তো আজ সঙ্গে নেই যে খাবার খাওয়াবেন।

ঝারসাগুদা থেকে সম্বলপুরে এক লাইন গিয়েচে। রাত্রে ট্রেনে বেশ ঘুম হল, সকালে এসে কলকাতায় উঠলুম—দুপুরটা ঘুম হল খুব।

আজ বিজয়া দশমী। কোথায় যাব—ভাবচি বিভূতিদের ওখানেই যাওয়া যাবেএখন।

আজ সারাদিনটা হৈ হৈ করে কাটল। সকালে উঠেই সজনীবাবুদের বাড়ি—সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর সকলে মিলে হিতেনবাবুদের বেলগেছিয়ার বাগানবাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে হল পিক্‌নিক্—মাংস সিদ্ধ হতে বাজল তিনটে। Living age কাগজখানাতে মেটারলিঙ্ক-এর নতুন বই 'Life of the Ants'সম্বন্ধে একটি ভারিউপাদেয় প্রবন্ধ পড়ছিলাম—সামনের পাইকপাড়া রাজাদের বাগানটিতে অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ ছায়া বর্ষাশেষের সরস, সবুজ গাছপালার উপর নেমে আসচে, ওধারের তালগাছগুলোমেঘশূন্য নীলাকাশের পটভূমিতে ওস্তাদ পটুয়ার হাতে আঁকা ল্যান্ডস্কেপের ছবির মতমনোহর হয়ে উঠেচে—কিন্তু আমি এই বৈকালটিকে আমার মনের সঙ্গে কি জানিআজ মোটেই খাপ খাওয়াতে পারচিনে—আমার মনের সুসম্বদ্ধ, সুনির্দিষ্ট অপরাহ্ণেরমালায় আজকার বেলগেছিয়া বাগানের ও সুন্দর অপরাহ্নটি বিস্তৃত শত অপরাহ্ন-মুক্তাবলীর পাশে কেন যে স্থান দিতে পারলাম না, তা জানি না। সেখান থেকে বেরিয়েগেলাম শাঁখারিটোলায় রাধাকান্তদের বাড়ি, তারপর দক্ষিণাবাবুদের বাড়ি, দক্ষিণাবাবুবাড়ি নেই। জ্যোৎস্না আদর-অভ্যর্থনা করলে, কাছে বসে খাওয়ালে। রাত এগারোটারপরে এলেন দক্ষিণাবাবু। গল্পে গুজবে হল রাত আড়াইটা—আজ আবার চন্দ্রগ্রহণ, কিন্তু মেঘের জন্যে কিছু দেখা গেল না। সারারাতের মধ্যে চোখের পাতা বুজানো গেল নামশায় ও গরমে—অনেকরাত্রে দেখি একটু একটু বৃষ্টি পড়চে।

এবার কালী পূজাতে দেশে গিয়ে সত্যই বড় আনন্দ পেলাম—এত সুন্দর গন্ধবন-ঝোপ থেকে ওঠে হেমন্তের প্রথমে, এবার খুঁজে খুঁজে দেখলাম গন্ধটা প্রধানত ওঠে বনমরিচার ফোটা ফুল থেকে ও কেলেকোঁড়ার ফুল থেকে। এবার আনন্দটা সত্যই অপূর্ব ধরনের হল যা অনেকদিন কলকাতায় থেকে অনুভব করিনি। নৌকার ওপরবসে বসে যেন জীবনটা আর একটা dimension-এ বেড়ে উঠল—ঘন লতাপাতারসুগন্ধে বহু অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে—খুকী দ্বিতীয়ার দিন আমার সঙ্গে আবার গেল বারাকপুরে—সেদিন আবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। জাহ্নবী আমাকে ফোঁটা দিলে—খুকী দিলে খোকাকে। পরে আমরা দুজনে পাকা রাস্তার ওপরে বেড়াবো বলে বেরুলাম— কিন্তু যাওয়া হয়ে গেল একেবারে বারাকপুরে—গাছপালা, প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠযোগ স্থাপন করে যে জীবন—তাই হয় সুখের, পরিপূর্ণ আনন্দের। এ আমি ভাল করেবুঝলাম সেদিন।

কয়দিন এখানে এসেও বেশ আনন্দেই কাটল—ঊষাদেবী এখানে এসেচেন ঢাকাথেকে, তাঁর ওখানে মধ্যে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করলুম—বেশ মেয়েটি—বেশ শিক্ষা আছে, সাহিত্য বিষয়ে সমঝদারও খুব সুন্দর। সুনীতিবাবুর বাড়িতে একদিন আমি ও সজনীবাবু গিয়ে—অনেকগুলো গ্রীক্ ও শক মুদ্রা, অনেকছবি, আবুরাজ্যের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলো মূর্তির ফটো—এই সব দেখেএলাম—প্রবাসী আপিসে আড্ডা যা চলচে ক'দিন, তাও খুব।

কাল জগদ্ধাত্রী পূজা—আমাদের চারদিন ছুটি আছে, রাত্রে গেলাম বিভূতিদের বাড়ি, অন্য অন্য বছরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—আজ কোথাও কিছু নেই—রাতন'টার সময় অক্ষয়বাবু ছোট বৈঠকখানায় রেডিও শুনচেন—অন্য বছর যে সময় আগন্তুকও নিমন্ত্রিতের ভিড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা সম্ভব হত না, কোথায় সে উৎসব গেল বাড়ির—যেন দীনহীন, মলিন সব ঘরগুলো, সিঁড়িটা, দালানটা। আমাকে অবশ্য খাওয়ার বিশেষ অনুরোধ করা ছিল—অক্ষয়বাবু ও খগেনবাবু বাইরে নিমন্ত্রণে গেল মেজ খোকাবাবুর বাড়ি। অনেক রাত্রে আমি, শীতল, বিভূতি একসঙ্গে বসে নিরামিষ ভোজ খেলাম। রাতবারোটাতে বাসায় ফিরলাম। শুয়েচি—চারিধার নিস্তব্ধ, নির্জন। চাঁদটা

পশ্চিম আকাশেনিষ্প্রভ হয়ে ঢলে পড়েচে—নক্ষত্রগুলো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়েচে, 'অপরাজিত'রঅপুর বন্য-জীবনের গোড়াটা লিখচি—তাই বসে বসে ভেবে এই বিচিত্র জীবনধারারকথা মনে হল—ভারি আনন্দ পেলাম।

আজ জগদ্ধাত্রী পূজার সকালবেলাটি; মনে পড়ে অনেক বছর আগে এই ঘরেই বসে বসে হার্ডির ছোট গল্প পড়তুম এইখানে। আজও সেই ঘরটি তেমনি নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কিন্তু পরিবর্তনও কি কম হয়েচে! তখনকার বিভূতি কত বড় হয়ে গিয়েচে— তখনকার সবাই কে কোথায় চলে গিয়েচে।

আগামী রবিবারে সুনীতিবাবু, অশোকবাবু, আমি ও সজনীবাবু—চারজনে মোটরে 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে যাওয়ার কথা আছে বৈকালের দিকে। দেখি কি হয়।

এইমাত্র মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তাঁর নব প্রকাশিত'কিশলয়' বইখানা পাঠিয়েচেন, দেখলাম।খুব ভাল লাগল বইটি।

আজকার দিনটি বেশ ভাল কাটল। সকালের দিকে খুব মেঘ ছিল, কিন্তু দুপুরেরপরে খুব রৌদ্র উঠল—তখন বেরিয়ে পড়া গেল—প্রবাসী আপিসে গিয়ে দেখিঅশোকবাবু ও সজনী দাস বসে। চা পানের পরই সজনীবাবু গিয়ে গাড়ি করেসুনীতিবাবুকে উঠিয়ে নিয়ে এল—পরে আমরা রওনা হলাম আমাদের গ্রামে। সজনীবাবু, অশোকবাবু, সুনীতিবাবু আর আমি। যশোর রোডে এসে ব্যাটারির তারটা জ্বলে উঠেএকটা অগ্নিকাণ্ড হত, কিন্তু সুনীতিবাবুর কুঁজোর জল দিয়ে সেটাকে থামানো গেল।

তারপরই খুব জোরে মোটর ছুটল—পথে মাঝে মাঝে রোদ, মাঝে মাঝে ছায়া—রোদই বেশি। আজ রবিবার, সাহেবরা কলকাতা থেকে বেড়াতে বেরিয়ে এক একগাছতলায় মোটর রেখে ছায়ায় শুয়ে আছে।

তারপর পৌঁছে গেলাম জোড়া-বটতলায়। ওখানেই মোটরখানা রইল, কারণ দিনকয়েকআগে আমাদের গ্রামের দিকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পথে এখনও একটু একটু কাদা। নেমে কাঁচাপথটা বেয়ে বরাবর চললুম, সুনীতিবাবু কাঁচা কোসো কুল ও সেঁয়াকুল খেতেখেতে চললেন, অশোকবাবু ছড়ি কাটবার কথা বলতেই সজনীবাবু চটি ফেলে ছুটলগাড়িতে ছুরি আনতে। গ্রামে ঢুকবার আগে এ-ফুলের ও-ফুলের নাম সব বলে দিলাম—কাঁঠালতলায় হেলা গুঁড়িতে গিয়ে সবাই বসল। তারপরে সইমার বাড়ি গিয়ে কিছুমুড়ির ব্যবস্থা করে একটা আসন পেতে সবাইকে বসালাম। সেখানে খাওয়া ও গল্পগুজবেরপরে আমাদের পোড়ো ভিটেটা দেখে রান্নাঘরের পোতা দিয়ে সবাই নেমে ঘন ছায়ায়ছায়ায় এলাম সলতেখাগী আমগাছের তলায়—সেই ময়না-কাঁটা গাছ থেকে ছড়ি কেটেনিলে অশোকবাবু ও সজনীবাবু—পরে তেঁতুলতলীর তলার বনের মধ্যে দেখা গেল একটা খুব বড় ও ভাল ময়নাকাঁটা গাছ—সেখান থেকে আর একটা ছড়ি কাটা হল। তারপর প্রায় বেলা গেল দেখে আমি খুব তাড়াতাড়ি করলাম—ওদের বন থেকে টেনে বার করে নিয়ে গেলুম কুঠিটায়। ছেলেবেলায় গ্রামের জামাইদের ডেকে নিয়ে কুঠিদেখাতুম। তারপর সে কাজটা অনেকদিন বন্ধ ছিল—বহুকাল বন্ধ ছিল। শেষে কাকেনিয়ে গিয়েছিলাম, তা তো মনে হয় না—বহুকাল পরে বাল্যের সে কুঠি দেখানো পুনরাবৃত্তিটা করলুম। তখন কুঠিটা আমার কাছে খুব গর্ব ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল—তাই যে কেউ নতুন লোক আসতো, তাকেই নিয়ে ছুটতাম কুঠি দেখাতে। আজ বহুদিন পরেসজনীবাবু, সুনীতিবাবু ও অশোকবাবুকে নিয়ে গেলাম সেখানে। কুঠিতে কিছু নেই। আজকাল এত জঙ্গল হয়ে পড়েচে যে আমি নিজেই প্রথমটা ঠিক করতে পারলুম নাকুঠিটা কোন্ জায়গায়।

তারপর মাঠ দিয়ে খানিকটা ছুটতে ছুটতে গেলাম। রাস্তায় পড়ে কাঁচিকাটার পুলে—এই কার্তিকমাসেও একটা গাছে একগাছ সোঁদালি ফুল দেখে বিস্মিত হলাম। সেইখানেঝোপটি কি অন্ধকারই হয়েচে! সুনীতিবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন—সবাইকে ডেকেদেখালেন—আমার বেশ মনে হচ্ছিল আমার পরিচিত সলতেখাগী তলায় যেখানেআমিই আজকাল কম যাই সেখানে—আমাদের ভিটেতে—সম্পূর্ণ কলকাতার মানুষ সুনীতিবাবু, অশোকবাবু, এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগছিল। আমাদের কুঠির মাঠে, আমাদেরসইমার বাড়ির রোয়াকে!

সন্ধ্যা হলে তেঁতুলতলার পথটা দিয়ে সবাই মিলে আবার ফিরলাম—ময়না-কাঁটারডালগুলো ওখান থেকে আবার নিলাম উঠিয়ে—সইমার বাড়ি এসে দেখি হরেন এসে বসে আছে। সইমার সঙ্গে সুনীতিবাবুর খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল—পরে আমরা বার হয়ে গিরিশদার বাড়ি এসে গেলাম—তখনই ওদের রান্নাঘরের পৈঠাতে জ্যোৎস্না উঠেগিয়েচে।

তারপরে গাজিতলার পথ দিয়ে হেঁটে মোটর ধরলুম—গোপালনগরের হাট-ফেরতালোক বসে আছে মোটর দেখবার জন্যে। খানকতক স্যান্ডউইচ্ ও ডালমুট কিছু খেয়ে নেওয়া গেল—কুঁজোর জল খেয়ে-টেয়ে গাড়ি স্টার্ট দেওয়া হল।

বঙ্কুর বাসায় এসে দেখি তরু বেচারীর চৌদ্দ পনের দিন জ্বর—বিছানায় শুয়ে আছে, বঙ্কু ফোড়ায় শয্যাগত—বঙ্কুর বৌ এসেচে, কিন্তু সে বেচারীর দুর্দশার সীমা নেই।সেখানে কিছু চা ও খাবার খাওয়ার পরে আমরা সুন্দর জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তায় সজোরে গাড়ি চালিয়ে রাত্রি সাড়ে ন'টাতে কলকাতার বাসায় এসে পৌঁছলাম। তখনও বাসায় খাওয়া আরম্ভ হয় নি—ঠাকুর তখনও রুটি গড়চে। আমিএসে টেবিল পেতে লিখতে বসে গেলাম, আর ভাবছিলাম এই খানিক আগে যখনসন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হল তখন ছিলুম আমাদের বাড়ির পিছনকার গাবতলার পথে—এরই মধ্যে কলকাতার বাসায় ফিরে এত সকাল-রাত্রে বারান্দার আলো জ্বেলে বসেলিখচি, এ কেমন হল?...

যদি মোটর না থাকতো তবে কখন পৌঁছতাম?...সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে সন্ধ্যার গাড়ি ধরে, বা বনগ্রাম থেকে ট্রেন ধরে, রাত্রি বারোটাতে কলকাতা পৌঁছতাম।

আমি সত্যই আজ একটা আনন্দ পেলুম। একটা অদ্ভুত—ও সুন্দর ধরনের আনন্দ পেলুম। ওঁরা গিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে—আমি আমার পরিচিত ও প্রিয় স্থানগুলিতে কলকাতার এই প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে বেড়িয়ে আজ সত্যই একটা নতুন ধরনের আনন্দ পেলুম যা আর কখনো কোন trip-এ পাইনি।

ইচ্ছা আছে বৈশাখ মাসের দিকে একবার এদিকে এসে ওঁদের নিয়ে ইছামতীতেনৌকা ভ্রমণ ও কোনো একটা বনের ধারে বনভোজন করা হবে। সুনীতিবাবুও সেপ্রস্তাব করলেন, সবাই তাতে রাজী।

কাল দুপুরে সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঠাকুরবাড়িতে ছিল নিমন্ত্রণ, সেখানে সকলের সঙ্গেগল্পগুজবে বেলা হল তিনটা, সেখান থেকে গেলুম 'গৈরিক পতাকা' দেখতে মনোমোহনে।

এ গেল কালকার কথা, কিন্তু আজ এমন অপূর্ব আনন্দ পেয়েচি বৈকালের দিকেযে, মনে হচ্চে জীবনে ক—ত দিন এ রকম অদ্ভুত ধরনের বিষাদের ও উত্তেজনারআনন্দ হয়নি আমার।

কিসে থেকে তা এল?অতি সামান্য কারণ থেকে। ক্লাসে দেবব্রত নাকি ছোট একটাখড়ি নিয়ে পকেটে রেখেছে, ক্লাসের মনিটার তার হাত মুচড়ে সেটা নিয়েচে কেড়ে।দেবব্রত এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললে; বললে, দেখুন স্যার, ওরাএত বড় বড় খড়ি নিয়ে যায় বাড়িতে—আর আমি এইটুকু নিলাম। আমার হাত মুচড়েও কেড়ে নিলে?—হাতে এমন লেগেচে!

ছোট ছেলের এ কান্না মনে বাজল। তখনি অবশ্যি মনিটারকে বকে খড়িটুকুদেবব্রতকেফেরত দেওয়ালাম, কিন্তু দুঃখটা আমার মনে রয়েই গেল।

সে কি অননুভূত দুঃখ ও বেদনা বোধ! ...দুপুরের রোদে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে মনেহল ভগবান আমাকে এক অপূর্ব ভাব-জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতেচান বুঝি। তিনিই হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায়, তাঁর কোন্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, তিনিই জানেন। অনন্ত জীবনের কতটুকু আমাদের শান্ত-দৃষ্টির নাগালেধরা দেয়? মনে হল বহুকাল আগে শৈশবে হরি ঠাকুরদাদা সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির দরজা থেকে চাল

চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েচেন—সেইদিনটিতেই আমারএই ভাব-জীবনের বোধহয় আরম্ভ। তারও আগে মনে আছে—মা যেদিন অতি শৈশবে ছোলা ও মুড়ি খেতে দিয়ে দিদিমার কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তাঁর গুরু এসেছিলেন, তিনি যে আমাদের জন্যে গুরুর পাতের মাছের ঝোল ও রুটি তুলে রেখে দিয়েছিলেন, মা তার খবর না জেনেই আমায় দিয়েছিলেন মুড়ি ও ছোলা ভাজা।—সেই ঘটনা থেকে মায়ের উপর এক অদ্ভুত স্নেহ ও বেদনা-বোধ—তার পরে জাহ্নবীর আমজরানো, পিসিমার শত দুঃখ, কামিনী পিসির কষ্ট,সেই যাত্রার দলের গান শেষ হওয়ার দিনগুলো—কত কি—কত কি; তারপরে বিভূতির কত কষ্ট! আজ আবার দেবব্রতেরকষ্ট—আমার সমগ্র ভাব-জীবনের সমষ্টি এই সব দুঃখ ও বেদনা, অবশ্য হয়তোঅনেক দুঃখ বাস্তব, অনেকটা কাল্পনিক—কিন্তু আমার মনে তাদের জন্য বেদনানুভূতি আদৌ কাল্পনিক নয়—তাদের সার্থকতা সেইখানেই।

যাক। তারপর স্কুলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি ছাদে নীরব সান্ধ্য আকাশের তলে প্রতিদিনের মত পায়চারী করতে লাগলাম—মনে এক অতীন্দ্রিয়আনন্দবোধ, সে আনন্দের তুলনা হয় না—ভেবে দেখলাম এই আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। কিসে থেকে তা আসে, সে কথা বিচারে কোনো সার্থকতা নেই আদৌ, —আনন্দ যে এসেচে, সেইটাই বড় কথা ও পরম সত্য। অনেক দিন পরে এ লেখাপড়ে আমারই মনের নিরানন্দ ও ভাবশূন্য মুহূর্তে আমার মনে হতে পারে যে, এ দিনেরআনন্দ একেবারেই অবাস্তব ও মনকে চোখ-ঠারা গোছের হয়তো—নিরানন্দের দিনে একথা মনে হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এই খাতায় কালির আঁচড়ে জানিয়েদিতে চাই যে তা নয়, তা নয়। এ আনন্দ অপূর্ব অননুভূত অতীন্দ্রিয়, মহনীয়!—এ ধরনের গভীর বেদনামিশ্রিত ভাবোপলব্ধি জীবনে খুব কম করেচি। করেচি হয়তোসে-দিন মালিপাড়ায় মাজু খাতুনের উপর পুলিসের অত্যাচার করার কথাটা খবরেরকাগজে পড়বার দিনটা—তারপর অনেকদিন হয়নি।

সন্ধ্যার নিস্তব্ধ ও ধূসর আকাশের বহুদূর প্রান্তের আমাদের ভিটাটার কথা মনে হলএকবার...বেশ দেখতে পেলাম সেখানে ঘন ছায়া পড়ে এসেচে—বনে সুগন্ধ উঠছেহেমন্তের দিনে— সেই ভিটা থেকে একদিন পথে, ঘাটে, বৈকালের ছায়ায়, দুপুরের রোদে যে আনন্দজীবনের শুরু, আমি এই ভেবে মুগ্ধ হই, তা এখনও অটুট, অক্ষুণ্ণরয়েচে—আরও পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে তার গতি নিত্য নবতর পথে।

আকাশের দিকে চাইলাম—মাথার উপর ধূসর আকাশে একটি নক্ষত্র মিট-মিটকরচে। সঙ্গে সঙ্গে কালকার থিয়েটারে শোনা গানটা গাইলাম, 'জনতার মাঝে জনগণপতি, বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন'। দেবব্রতের মত ক্ষুদ্র ও সুদর্শন এক দেবশিশুর ছবি মনে উঠল, ঐ ছবি বিশ্বের অজানা-অচেনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বালক তার অপূর্বশৈশব যাপন করচে আনন্দে, সহাস্য কলরবে, দায়িত্বহীন কৌতুকের উচ্ছ্বাসে। তারপরেতার জীবনের সে সব বহুবর্ষব্যাপী বিরাট কর্মযজ্ঞ, সে গভীর বেদনাপূর্ণ ট্র্যাজেডি—কত যুগব্যাপী দুঃখ-সুখের শুরু—পৃথিবীর মানুষেরা যা কোনো দিন ধারণাই করতে পারে না।উঃ, সে কি অদ্ভুত অনুভূতিই হল যখন এ ছবি আমার মনে উঠল।

আজ বুঝলাম এই অনুভূতিই আসল জীবন। আমি নিরানন্দ দিনগুলিতে দেখেচি মন কিছুতেই আনন্দ পেতে চায় না—টেনেটুনে কত করে, কত নক্ষত্র জগৎ, এ, ও, নানা ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে জোর করে আনন্দ আনতে হয়, তা যাও বা একটু আধটু আনে— তাতেই তখন মনে হয়, না জানি কত বড় অনুভূতিই বুঝি বা হল। কিন্তু আসল ও সত্যিকার আনন্দের মুহূর্তে বোঝা যায় সে অনুভূতি ছিল অগভীর, মেকি, টেনে-বুনে আনা। আসল আনন্দকে জোর করে, মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আনতে হয় না তা আজ বুঝেচি— সে সহজ অর্থাৎ spontaneous।

আর ও অনুভূতি যার জীবনে না হয়েচে অর্থের মানে, যশের প্রাচুর্যে তার দীনতা ঘোচাতে পারে না।

'অপরাজিত' উপন্যাসের বন-ভ্রমণ লিখচি আজ।

কাল স্কুল কমিটির মিটিং-এ ওরা সুবোধবাবুকে নোটিস দিলে—আমি আগে জানলে হতে দিতাম না—আমায় আগে ওরা জানায়ওনি, যদিও সাহেবের কোনো দোষছিল না, সাহেব আমাকে জানাবার কথা বলেছিল সুরেশবাবুকে। শেষকালে চেষ্টাকরেও কিছু করা গেল না— বেচারীকে যেতেই হল। এই বেকার-সমস্যার দিনে

একজন Young man-এর চাকরি এভাবে নেওয়া বড় খারাপ কাজ, মনে বড় কষ্ট হল...সুবোধবাবু মুখটি চুন করে বসলো কাল রাত্রে, কি করি আমার তো আর কোনো হাতই নেই।

আশ্চর্যের বিষয় আজ পয়লা অগ্রহায়ণ, কিন্তু এত গরম যে সকালে কার্তিক পূজার ছুটির দিনটা বলে রমাপ্রসন্নর ওখানে বেড়াতে গেলাম। সেখানে সুরেশবাবুর আগ্রা ভ্রমণের গল্প শুনে ফিরে এসে, বেলা আটটার সময় এত গরম বোধ করতে লাগলাম যে, তাড়াতাড়ি নাইতে গেলাম—এবং মনে খুব আনন্দ হল, আরাম পেলুম, বালতির পর বালতি ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে লাগলাম—এত গরম।

এ সময়ে এত গরম আর কখনো কলকাতায় দেখেচি বলে তো মনে হয় না।

অনেকদিন লিখিনি—বাজে জিনিস না লেখাই ভাল, অন্তত এ-খাতায়। আজদুপুরটাতে কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, কবিশেখর কালিদাস রায় ও দক্ষিণাবাবুর বাড়ি—সেখান থেকে এসে বারান্দাতে বসেছিলাম, হঠাৎ মনে হল একবার নিউমার্কেটে গিয়ে Wide World Magazine দেখে আসি।

শাঁখারীটোলায় ভীমেদের বাড়িতে গেলাম, ওরা আজ নতুন খাতা করতে বেরিয়েচে। মোড়ের মাথায় টাটি একটা মুদীর দোকানে দাঁড়িয়ে হালখাতা করচে—তাকে ডেকেআদর করে ভারি আনন্দ পেলাম—তারপর নিউ মার্কেট ঘুরে এই মাত্র ফিরে আসচি।বেজায় গরম পড়েচে আজ কলকাতায়।

জীবনের সৌন্দর্যের কথাই শুধু আজ ক'দিন ধরে ভাবচি। কি জানি কেন শুধুই মনেপড়চে ছেলেবেলায় যে টক এঁচড়ের চচ্চড়ি ও টক কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতুমরান্নাঘরের দাওয়ায় বসে—সেই কথা। সেই মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধের কথা। জীবনটারকথা ভাবলেই আনন্দে মুগ্ধ হতে হয়। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্তন, এত রস, এত যাওয়া-আসা—ভেবে অবাক হয়ে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে এই মাত্র ক্যাম্বেল স্কুলটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, মানুষঅনন্তের সন্তান—একথা মিথ্যা নয়, কে বলে মিথ্যা! ...সমগ্র নক্ষত্র জগতের জীবন—জরাহীন, মৃত্যুহীন, অপরাজেয় জীবন-ধারা তার নিজস্ব। সকল নক্ষত্রের পাশের দেশেওই যে নক্ষত্রটা আমার বারান্দার ওপর মিটিমিটি জ্বলচে—ওদের চারিপাশে আমাদের মত গ্রহরাজি আছে হয়তো—তাতেও জীব আছে, অন্য বিবর্তনের প্রাণী হলেও তাদের সুখ-দুঃখ, শিল্প, অনুভূতি, মৃত্যু, প্রেম সবই আছে—দূরের নীহারিকা, Globular Cluster-দের জগৎ, সে সব তো আলাদা বিশ্ব, তাতে তো অপূর্ব অজ্ঞাত সব জীবনধারা—আমার জীবনও তো, কত দূর পথ চেয়ে কত অনন্ত সৌন্দর্যস্তম্ভের মধ্যে দিয়ে কাটবে তা কে জানে?...

এই বড় জীবনটা আমার....

মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পৌঁছে দিতে হবে যে, সে ছোট নয়, সে বড়, সেঅনন্ত। যদি যুগে যুগে আসি যাই তা হলেও তো ওরকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দচাঁপার গন্ধ, কত টক কলাইয়ের ডাল আমার হবে।

কিন্তু প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখির বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনো শুকনো সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী—মৃত, মূর্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।

আইনস্টাইন্ বলেচেন—বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা; যে কোনো কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে মৃত সে বেঁচে নেই। আমাদের দেশের কেউ এ কথা বুঝবেন কি?

এই জন্যেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায় দেউলে হয়ে পড়ে—নতুন বিস্ময়, নতুন অনুভূতি হয় না, নবতর জীবনের পথ চিরগুপ্ত রয়ে যায় তাদেরকাছে—মানুষ দমে যায় জানি—কিছুকাল তার মনে সব শক্তি হয়তো ক্ষীণতর হতেপারে মানি—কিন্তু জীবন্ত যে মানুষ, সে আবার জেগে উঠবে, সে আবার নবতরবংশীধ্বনি শুনবে—নব জীবনের সন্ধান পাবে। অপরাজিত প্রাণ-ধারার কোন্ অদৃশ্যউৎসমুখ তার আবার খুলে যাবে, বি-জর ও বি-মৃত্যু-আনন্দ তার চিরশ্যামল মনেআবার আসন পাতবে। বিহার অঞ্চলে দেখেচি শীতের শেষে বনে আগুন দেয়, সব ঘাসএকেবারে পুড়িয়ে ফেলে—কি জন্যে? যে জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র পড়বে—ওই দগ্ধ ঝোপ-ঝাপেরগোড়া থেকে আবার নবীন, শ্যামল, সুকুমার তৃণরাজি উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রাচুর্যে বেড়ে উঠতে থাকবে—হু-হু করে বাড়ে, পনেরো দিনের মধ্যে সারা কালো গোটা ঘাসের বন ঘন শ্যামশ্রী ধরে—এই তো জীবন, এই তো অমরতা।

তাই ভাবি, মাস বছর ধরে মানুষের বয়স ঠিক করা কত ভুল। ১৩৩৮ সাল পড়ে গেল আজ, আমার বয়স এক বৎসর বেড়ে গেল বটে হিসেবমত—কিন্তু আমি কিদশ বৎসর কিংবা পনেরো বছর আগেকার সেই বালক নেই অল্পবিস্তর?

সেদিন গেছলাম রাজপুরে অনেক কাল পরে। খিনুর সঙ্গে দেখা হল। আবারপুরনো পুকুরের পথটা ধরে হাঁটলাম—বাঁশগুলো নীচু হয়ে পড়ে আছে—চড়কের সন্ন্যাসীর দল বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। দুটোর ট্রেনে ফিরে সাড়ে পাঁচটায় স্কুলের মিটিং করলুম। রসিদকে আজ তাড়ানো হল।

পথে কোন্ জায়গায় ফুটন্ত মালতীলতার ফুলের গন্ধ, জারমলীন আপিসের কাছে—গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের স্মৃতিটা হঠাৎ মনে পড়ল।

সেদিন বঙ্কু বলছিল—বাঁকি-করিমালি। পরিচিত নাম, বাবার মুখে ছেলেবেলায়শুনেছিলাম কবে—ভুলে গেছলাম, যুগান্ত পরে যেন কথাটা আবার শুনলাম বলে মনে হল।

অনেকদিন পরে আজ রবিবারটি বেশ কাটলো। শীঘ্রই গরমের ছুটি হবে, কালরাত্রে বাইরের বারান্দায় বৃষ্টি পড়াতে বিছানা টানাটানি করে ভাল ঘুম হয়নি, উঠতেএকটু বেলা হয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে কলেজ স্কোয়ারের দোকানটাতে খাবার খেতেগেলুম—ওরা বেশ হালুয়া করে। তারপর গোলদীঘির মধ্যে বসে কামাতে লাগলুমএকটা নাপিতের কাছে। ওদিকে অনেকগুলি গাছ, একটা গাছে সোঁদালি ফুল ফুটেচে—এমন একটা অপরূপ আনন্দ ও উত্তেজনা এল মনে ফুটন্ত ফুলেভরা গাছটা দেখে—মনে হল আর বেশি দেরি নেই, এক সপ্তাহ পরে ঐ রকম ফুলেভরা বন-মাঠে গিয়ে 'অপরাজিত'-র শেষ অধ্যায়টা লিখবো—সত্যি, জীবনে দেখেচি ভবিষ্যতের ভাবনায়সব সময়ই এত আনন্দ পাই! ফিরে এসে অনেকক্ষণ বই লিখলুম। দুপুরে একটুঘুমুবার চেষ্টা করা গেল—ঘুম আদৌ হল না। বেলা আড়াইটার সময় দরজায় শব্দ শুনেখুলে দেখি নীরদবাবু। তার গাড়ি নীচেই দাঁড়িয়েছিল—দুজনে উঠে একেবারে দমদমায় সুশীলবাবুর বাগানে। সত্যি, ওদের সাহচর্য এত সুন্দর লাগে আমার—সত্যিকার প্রাণবন্ত সজীব মন ওদের। সেখানে বাইরের মাঠে চেয়ার পেতে বসে নানা বিষয়ের আলোচনা হল—চা-পান সমাপন হল। শান্তিনিকেতন থেকে অমিয় চক্রবর্তী 'পথের পাঁচালী'সম্বন্ধে লিখেছেন, 'বই পড়ে গ্রামখানি দেখতে ইচ্ছা হয়'—আর লিখেচেন, "শিল্পীর সৃষ্টগ্রামখানি শাশ্বতকালের, জানি না ভৌগোলিক গ্রামখানা কি রকম দেখবো।'

ছ'টার সময় নীরদবাবুর গাড়ি করে ফিরলুম—কারণ রবিবাসর ছিল প্রেমোৎপলবাবুর বাড়িতে। আজ খুব মেঘ করেছে, দমদমা থেকে আসতে মেঘান্ধকার পুব-আকাশেরদিকে চেয়ে আমার পুরনো ভিটা ও বাঁশবনের কথা, মায়ের কড়াখানার কথা ভাবছিলুম—কি অদ্ভুত প্রেরণাই দিয়েচে এরা জীবনে—সত্যি! ...নীরদবাবুও গাড়িতে বললেন,কড়াখানার দৃশ্য তাঁকে সেদিন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ও অনুভূতি এনে দিয়েছিলমনে—গত রবিবারে সেদিন যখন ওঁরা ওখানে গিয়েছিলেন। তারপর এলুম রবিবাসরে, ওখানে তখন প্রবন্ধ পাঠ শেষ হয়ে গিয়েচে—তরমুজের আইস•ক্রিম ও খাবার খুব খাওয়া গেল। অতুলবাবুর কাছে একটা Spiritual Circle-এর ঠিকানা নিলুম। নীরদআমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে

আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত এল—অশোকবাবু ওসজনীবাবুদের সম্বন্ধে নানা কথা। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি যাচ্চেন সুবোধবাবুরপিতৃ-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে। বাড়ি চলে এলুম।

আজ ভাবচি, গ্রাম সম্বন্ধে একটা সত্যকার ভালবাসা ও টান ছিল শৈশব থেকেআমার মনে। কি চোখেই দেখেছিলুম বারাকপুরটাকে—যখন প্রথম মামার বাড়ি থেকেঅনেককাল পরে দেশে ফিরি, পিসিমা ওই দিকের বাঁশবাগান দিয়ে আসেন। কাল তাইযখন শাঁখারীটোলার দখল-করা বাড়িটার সামনে পুরনো জমিদারী কাগজের মধ্যে১৩১০ সালের একখানা পুরনো চিঠি কুড়িয়ে পেলাম, তখনি মনে হল,—আচ্ছা এমনিদিনে দশ বৎসরের ক্ষুদ্র বালক আমি কি করছিলাম! মনে একটা thrill হল, একটুনেশা-মত যেন! ...কোনো সত্যিকার জিনিস মিথ্যে হয় না—সেই বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটেরমধ্যে দিয়ে আজ দুপুরে নীরদবাবুর গাড়ি করে গেলাম, যে বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটের বাড়িতেএকদিন কত কষ্টে কালযাপন করেচি! ...ওখানেই কষ্ট পেয়েচি, ওখানেই ভগবান সুখদিলেন। সত্যিকার অনুভূতি অমর, তা বৃথা যায় না—আমার শৈশব মনের সে জীবন্ত, প্রাণবান ভালবাসা, গ্রামের প্রতিটি বাঁশের-খোলা ও গাবগাছটাকে অতি নিকটে আপনার জন বলে ভাববার অনুভূতি ছিল সত্যিকার জিনিস—তাই আজ বহু সমঝদার মনে, সেঅনুভূতিটুকু সঞ্চার করতে কৃতকার্য হয়েচি। সাহিত্য-সৃষ্টি মেকী জিনিস নয়, তারপিছনে যখন সত্যকার প্রেরণা না থাকে, একটা বড় অনুভূতি বা দৃষ্টি বা ভালবাসা নাথাকে—সেটা কখনোই বড় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না—খুব কলাকৌশল হয়তোদেখানো চলতে পারে, খুব cleverness-এর পাঁয়তারা ভাজা যেতে পারে হয়তো, কিন্তুতা সত্যিকার বড় জিনিস হয়ে উঠতে পারে না কোনো কালেও।

চারিধারে মেঘান্ধকারে আকাশের কি শোভাটা আজ রাত্রে। ...ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্চে—আমার বহু বাল্যদিনের অনুভূতি মনে আসচে—I am re-living my childhood days—কোন্ দিনটার কথা মনে আসচে আজ? ...যেদিন বাবার সঙ্গে তম্‌রেজ ও আমি দক্ষিণ মাঠের চাটুয্যেদের জমি মাপতে যাই, প্রথম দক্ষিণ মাঠ দেখলাম—কতকুশবন, খোলা মাঠ, আকন্দ গাছ, সেই একদিন আরযেদিন আতরালি কালীদের গরুর লেজ কেটে দিয়েছিল, চণ্ডীমণ্ডপে তার বিচার হল—এই দুটি দিন।

আজ দুপুরে হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা এসেছিল। একখানা বই দিলাম, নিয়ে গেল।

এইমাত্র ভয়ানক দু-ঘণ্টাব্যাপী ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল—এ বছরে এই প্রথম বৃষ্টি—সামনের রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেচে—একটা পাগল কি চীৎকার করে বলতে বলতেযাচ্ছে।

এখনও একটু একটু বৃষ্টি হচ্চে—আর জোর বিদ্যুৎ চমকাচ্চে—মোটরগুলো জলভেঙে যাচ্চে—কি শব্দটা! রবিবাসরে যে বেলফুলের মালাটা দিয়েচে—তার সুন্দর গন্ধবেরুচ্চে। রাত এগারটা।

আজ রাত্রে ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে না—একটা উত্তেজনা, একটা অপূর্ব অনুভূতিরআনন্দ। অনেকদিন পরে মনে পড়ে একটা কথা। বাবা আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরেঅভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কৈ, খোকা—? অথচ তিনি জানতেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেননি।জীবনের সেই প্রথম শোক। সে কি অপূর্ব অনুভূতির দিনগুলো—তার কি তুলনাআছে? হাজার বছর বাঁচলেও কি সে সব দিনের কথা ভুলবো কখনও!...

এই দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়েই কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েচি।

বাইরের অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। কি অদ্ভুত যে মনেহচ্ছিল! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, কোন্ মহাশক্তির বিরাট কন্দুকক্রীড়া যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তার প্রাণীদলের উত্থান-পতনে—যুগ-যুগান্তর ধরে প্রাণীদল তাদের অতি সত্যকার হাসি-অশ্রু সুখ দুঃখ ধরে, কোথায় ভেসে চলে গিয়েচে—ওপরে সব সময় লক্ষ বৎসরধরে এই মহাশক্তিটি তার বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, জানা-অজানা কত শক্তি নিয়ে কোন্ কাজ করছেন তা

বুঝতেও পারচিনে আমরা। মোটে তো পঁয়ত্রিশ বছর এই ব্যাপার দেখচি—তাও না জ্ঞান হয়েচে আজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। লক্ষ বৎসরের তুলনায়সাতাশ বছর কতটুকু?...সত্যিই এমন সব জীব আছেন, যাঁদের তুলনায় এই পঁয়ত্রিশ বছরের আমি—আমার সৃষ্ট বালক অপুর মতই অবোধ, অসহায়, কৃপা ও করুণারপাত্র—নিতান্ত শিশু। কি জানি, কি বুঝি? ...কত আবোল তাবোল ভাবি, কোনোটাইহয়তো সত্যি নয় তার।

সত্যি কি অপূর্ব বৈকাল। ...আজ অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি। এই দশ-বারো দিন বৃষ্টির জন্যে আর সুবিধা করতে পারিনি। আজ একেবারে মেঘনির্মুক্ত, অদ্ভুতবৈকালটি। কাল খিনুর বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে পদ্ম-ফোটা লওদার বিলের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরি—ফিরতে দেরি হয়ে গেল। আজ তাই দুপুরে খুব ঘুমিয়েচি।উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। সত্যি, এ অপূর্ব দেশ...এ ধরনের অনুভূতি, গহন-গভীর, উদাস, বিষাদমাখা, আমি কোথাও কখনো দেখেচি মনে হয় না—এ সত্যিই Land of Lotus Eaters. এত ছায়া, এত পাখির গান, এত ডাঁসা খেজুরের সুগন্ধ, এত অতীত স্মৃতি—বেদনা-মধুর ও করুণ, আর কোথায় পেয়েচি কবে? ...শরীর অবশ হয়ে যায়, মন অবশ হয়ে যায় অনুভূতির গভীরতায়, প্রাচুর্যে।

এইমাত্র আমাদের ভিটাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—এক টুকরা রেশমী সবুজ চুড়িরটুকরো চোখে পড়ল—কার? হয়তো মণির। মনে হল মায়ের স্মৃতি ভিটার সঙ্গে যেন মাখা। মা এই বৈকালে ঘাট থেকে গা ধুয়ে ফর্সা কাপড় পরে এসে আমাদের খাবারদিচ্চেন—এই ছবিই বার বার মনে আসে। আজ সব জঙ্গল, নিবিড় বনভূমি হয়ে পড়েআছে! মায়ের সেই সজনে গাছটা আছে, সেই কড়াটা—আশ্চর্য, পাঁচিলের সেই কুলুঙ্গিদুটো চমৎকার আছে, এখনও নতুন।

ভেবেছিলাম এখনি কুঠির মাঠে যাবো। গিয়ে কি করবো? অনুভূতি কি এখানেই কিছু কম যে, আবার সেখানে যাবো? একদিনে কত সঞ্চয় করি, মনে স্থান দিইকোথায়!...বকুলগাছে পাখি ডাকচে—বৌ-কথা-ক', বৌ-কথা-ক',—অমূল্য জামগাছেউঠে জাম পাড়ছিল—বুড়ি পিসিমা বললে, সে চারটি জাম দিয়ে গেল, তাই এখনখাবো। আজ আবার গোপালনগরের দলের যাত্রা হবে, এখন স্নান করে এসে যাত্রাশুনতে যাবো।

বেলা খুব পড়ে গিয়েছে—ছায়া ধূসর হয়ে এসেচে। এমন বিকাল কোথাও দেখিনি। আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি—মেঘশূন্য সুনীল আকাশে খুব জ্যোৎস্না উঠবে।

আদাড়ি বিল্‌বিলে থেকে জল নিয়ে বাড়ি ফিরচে হরিকাকাদের বাড়ির ওদিকের সুঁড়িপথটায়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে বাল্যে কিসের শব্দটা বেরুতো, সেই শব্দটা বেরুচ্চে। মায়েরকথাই আবার মনে হয়।

অনেক রাত্রে বায়োস্কোপ দেখে ফিরলাম—ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি,মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকাচ্চে, মেঘান্ধকার আকাশ, রাস্তায় জল জমে গিয়েচে তার মধ্যে বাস্খানা কেমন চলে এল! যেন এরোপ্লেনে উড়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্চি।

বাইরের বারান্দাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—একটা Vision দেখলাম—একদেবতা যেন এইরকম অন্ধকার আকাশপথে, তুষারবর্ষী-হিমশূন্যে এক হাজার আলোকবর্ষে চলেচেন অনবরত—দূর থেকে সুদূরে তাঁর গতি। কোথায় যাবেন স্থিরতা নেই—চলেচেন, চলেচেন, অনবরত চলেচেন, হাজার বছর কেটে গেল। বিরাম বিশ্রাম নাই—Greatness of space. Undaunted travels ofগ্রহদেব।

সেদিন পাঁচুগোপালের সঙ্গে ভগবতীপ্রসন্ন সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম। ছেলেবেলাকার সে স্থানটি হয়তো আর কখনও দেখতুম না—কিন্তু আবার সেই 'পরশুরামের মাতৃহত্যা' যাত্রাটি হয়েছিল, সেটি আবার দেখলাম—যে ঘরে বসে বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণখেয়েছিলাম—ভগবতীবাবু যে রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন কতকাল আগে আমারনয় বছরের শৈশবে—লেখো'রত্নগর্ভ' বলে, সেই কথাটি মনে পড়ল এতকাল পরে।

সত্যিই জীবনটা অপূর্ব শিল্প—কি বলে প্রকাশ করি এর গভীর অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য, এর নবীনত্ব, এর চারু কমনীয়তা—আবার সেই পথটি দিয়ে ফিরে এলাম, যে পথেবাবার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতুম। ...বিজয়রত্ন সেনের সেই বাড়িটা আজ আটাশ বছর পরেআবার দেখলাম।

আজ সকালে উঠে স্নান সেরে রামরাজাতলা গিয়েছিলুম ননীর সঙ্গে দেখা করতে।স্থানটা আমার ভাল লাগেনি আদৌ। পল্লীর শ্রী-সৌন্দর্য নেই, অথচ শহরের মহনীয়তাও নেই—শহরের মধ্যে দীনতা নেই, কুশ্রীতা কম, যেদিকে চাই, বড় বড় সৌধ, বিশাল আকাশ—আর ওখানে পল্লীর অপূর্ব বনসন্নিবেশ নেই, Space নেই—আছে খোলা ড্রেন, দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটির তেলের আলো আর ওলকচুর বর্ষাপ্রবৃদ্ধ ঘেঁষাঘেঁষি।ননীর সঙ্গে অনেক কথা হল। ছেলেটির মধ্যে সত্যিই কিছু ছিল, কিন্তু গেঁয়ো হয়েখুলতে পারছে না। ওকে কলকাতায় এনে ভাল সমাজে পরিচিত করে দেব।

বিকেলে বাসায় ফিরলাম। কি সুন্দর আকাশ!...বৃষ্টি নেই অনেকদিন, অথচ মেঘেরপাহাড় নানা স্থানে আকাশে। কেমন যে মনে হচ্চিল, তা কি করে বলি।...বেলা পাঁচটাতেরবিবাসর ছিল প্রবাসী আপিসে। হেমেনের গানের কথা ছিল, প্রথমে অনেকক্ষণ সেএল না। আমি, সজনী, অজিত সকলেই ব্যগ্রভাবে তার প্রতীক্ষায় ছিলাম। রবিবাসরেযাবার পথে রাধাকান্তদের মাস্টার সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা।

সুশীলবাবু বিভূতির কথা উল্লেখ করে অনেক দুঃখ করলেন। সত্যিই ছেলেটাখারাপ হয়ে যাচ্চে সবাই বলে। অক্ষয়বাবুর নাকি মধ্যে একদিন ফিট হয়েছিল গাড়িতে—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। ওদের সম্পত্তিটা অভিশপ্ত—সংযম ও উদারতার অভাবে এবং কতকটা কুশিক্ষা ও দাম্ভিকতার ফলেও ওদের সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

এই সব ভাবচি এমন সময় হেমেন এল, গান আরম্ভ হল। শৈলজা বলছিল তাকে কে কে blackmail করেচে। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দলাদলি সত্যিই দুঃখের বিষয়। নীহারবাবু বললে, ওর কে একজন দাদা 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বলেচেন, অমন বইআর হবে না। সজনী 'অপরাজিত' নিতে চাইলে। খুব খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা হল।হেমেন সত্যিই বললে বাঙ্গালীর নিষ্ঠা ও সাধনার অভাব—সস্তা হাততালি ও নামকিনবার প্রলোভনে আমরা যেতে বসেচি।

হেমেন ও আমি নানা পুরনো কথা বলতে বলতে শেয়ালদা পর্যন্ত এলাম—ওকেপার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে বললুম, পুজোর ছুটিতে লক্ষ্ণৌতে আবার দেখাহবে।

সত্যিই বড় ভালবাসি হেমেনকে।

চাঁদ ওঠেনি, কিন্তু আকাশে খুব মেঘ নেই। খুব হাওয়া।

রাত দশটা—বাসার বারান্দায় বসে লিখচি। দূরের সেই মাকাল লতা দোলানো ভিটের কথা মনে পড়চে—বর্ষাকালে খুব জঙ্গল বেড়েচে। আজ বৈকালটি কি অপূর্বহয়েছিল সেখানে...কেবল সেই কথা ভাবি। সেখান থেকে প্রথম জীবন শুরু করেছিলাম—কত পথে চলেচি, কত আলাপী বন্ধুর হাত ধরে—কিন্তু সে জঙ্গলে-ভরাভিটেটা কি ভুলেচি!...

ননীকে একদিন সত্যিকার বাংলার রূপ দেখাব।

তারপর সারা রাত আর ঘুম হল না। এত অপূর্ব জ্যোৎস্নাও কলকাতায় আরকখনো দেখিনি যেন—বর্ষাধৌত নির্মল আকাশে সে কি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার খেলা!সারারাতের মধ্যে আমি ঘুমুতে পারলাম না—গুন্‌গুন্‌ করে গাচ্ছিলাম—

"প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,

হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে”

কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা এল—সারারাতের মধ্যে চোখ বুজল না মোটে।

সেদিন নীরদবাবু ও সুশীলবাবুর সঙ্গে মোটরে বহুকাল পরে যশোর গিয়েছিলাম—আবার স্কুলটা দেখলাম,—আবার চাঁচড়া দেখলাম। শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যারমন্দির দেখতে দেখতে কি অদ্ভুত ভাব যে মনে জাগছিল—চারিধারের ঘন সবুজ বেতঝোপ, পুরনো মজা দীঘি—মহলের পর মহল নির্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায়শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথরপুরীর মত দেখাচ্ছিল। পেছনের ঘাট-বাঁধানোপ্রকাণ্ড দীঘিটাই বা কি অদ্ভুত! ..রাজা রামচন্দ্র খাঁয়ের চাল ধোয়া পুকুরই বা দেখলামকতকাল পরে। একটা একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেচে।...এই ভাঙা পুরী, বনেদী ঘরেরদারিদ্র্য, জীবনের দুঃখ-কষ্ট—Back-ground-এ সব সময়ই পুরাতন দিনের আড়ম্বরও ঐশ্বর্য—সহস্র tradition—এই সব নিয়ে।

সাধনার কথা বলছিলাম কাল কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে। সাধনা চাই। আমি টুইশানিছেড়ে দেব। অপরাজিত তো শেষ হয়েচে—এইবার ছাপা আরম্ভ হবে—কিন্তু এই সময় সাধনা চাই।

(১) ভাল ভাল উপন্যাসকার ও ছোটগল্প লেখকদের পুস্তক পাঠ।

(২) ইতিহাস, Biology ও Astronomy সম্বন্ধে আরও বই পড়া।

(৩) Philosophy সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাবীদদের বই পড়া।

(4) Sir Thomas Browne ও Anatole France-এর বই আরও ভাল করে পড়া।

(৫) চিন্তা, ভ্রমণ, গল্প ও আড্ডা—ভাল সম্প্রদায়ে।

(৬) পল্লীতে যাওয়া ও Quaint ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ।

সাধনা ভিন্ন উচ্চ Outlook কি করে develop করে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে—আরও চাই—আরও অনেক চাই।

১৯২৫ সালের, কি ১৯৩২ সালের আমি, আর বর্তমান আমি কি এক? অনেক বেড়েচি—সেটা বেশ বুঝতে পারি—এই দুঃখ, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে-পড়ানোরমধ্যে দিয়েও বেড়ে উঠচি। মানুষ কখন কি ভাবে কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়েওঠে—তা কেউ জানে না।

ক’টা দিন বেশ কাটল। সেদিন হাওড়ায় রায় সাহেব সুরেশ সেনের ওখানে একটাপার্টি ছিল। সুশীলবাবু আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন—রমেশবাবু, নীরদবাবুসবাই সেখানে। তারপর জ্যোৎস্না-রাত্রে গঙ্গার উপর দিয়ে ফেরা গেল। শনিবারেসকালে সকালে কাজ মিটতো, সাহেব এক গোলমাল পাকিয়ে দিলে—বললে, তোমারনাম সিনেট থেকে যায়নি। সিন্ডিকেটের সেদিনই মিটিং—ছুটির পরে ফণিবাবু ও আমিদুজনে মিলে সুনীতিবাবুর কাছে গেলাম। বাড়িতে দেখা না পেয়ে ইউনিভার্সিটি—সেখানে দেখা হল। তারপর আমরা কলেজ স্কোয়ারে অনেকক্ষণ বসে গল্প করলুম। সেখানে থেকে ইনস্টিট্যুটে রাগিণী দেবীর নৃত্যকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ফণিবাবু আমাকেY.M.C.A-এর সামনে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে গেল। আমি X. Library-তে যাবো। সেখানে সজনীবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রয়োজন। যাওয়ার সময় তাকে সেখানে না দেখে ‘শনিবারের চিঠি’ আপিসে চলে গেলাম। সেখানে নেই, আবার এলাম ফিরে, আজ নাকি হরতাল—কেউ আসেনি। ওখান থেকে বাস্-এ চেপেশ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে ভবানীপুরে। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করেই মুরলীবাবুর বাড়ি। তারপরঅনেক রাত্রে ট্রামে বাসা।

পরদিন ছুটির পরে সুনীতিবাবুর সঙ্গে engagement. সকালে সজনীর ওখানেগেলাম। লুচি ও চা সজনীর স্ত্রী যত্ন করে খাওয়ালেন। সেখান থেকে দুজনে 'শনিবারেরচিঠি'র আপিস—আমি খানিকক্ষণ প্রুফ দেখে স্কুলে এলাম ও ছুটির পরে ইউনিভার্সিটিতেগেলাম। প্রথমে অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলারের আপিসে। কেউ নেই—পরে দেখি সাহেবরেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলুম, একটুপরেই সাহেব বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করা গেল। তারপর হেরম্ববাবু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব, মিঃ বটম্‌লি, একে একে সবাই এলেন। পাঁচটার পরে আমি ওখান থেকে ফিরে সোজা 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। গোপাল হালদারের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে সেখানে ঘোর তর্ক। সুনীতিবাবু এলেন—গল্পগুজবের পরে আমি, সুনীতিবাবু ও প্রমথবাবু তিনজনে গল্প করতে করতে বেরুনো গেল।

সুনীতিবাবু 'পথের পাঁচালী' ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।প্রমথবাবু ইটালিয়ানের প্রোফেসর ইউনিভার্সিটিতে, তিনি আমার সঙ্গে আমার বাড়িএলেন। আমার বইখানা ইটালিয়ানে অনুবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা হল। ইটালিতে আমায় পাঠানো সম্বন্ধে বললেন।...তিনজন ভদ্রলোক এসে দেখি বাসায় বসে আছেন—তারা কালকের একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে এসেচেন।

সকালে উঠে স্কুলে গেলাম ও শনিবার সকালে ছুটির পরেই বাসায় এলাম।অনেকক্ষণ ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল। আন্দাজ চারটার সময় উঠে হ্যারিসন রোড দিয়েযাচ্ছি—শীতল পেছন থেকে ডাকলে ও একখানা পত্র দিলে। একটা সভা আছে ওদের বাড়ি—আমি সভাপতি। প্রথমে গেলাম হেঁটে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে—সেখানে Copy দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে (খুকীকে যে পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছলাম সেইপথটা ধরে) বিডন স্কোয়ার। সেখানে একটা বেঞ্চির উপর বসে কত কথা ভাবলাম। মায়ের পোঁতা সেই সজনে গাছটার কথা এত যে মনে হয় কেন? মনে হল, যে জীবনটায় আর কখনো ফিরবো না—যা শেষ হয়ে গিয়েচে, ওই সজনে গাছটা এখনও কার ফিরবার আশায় সেই দিনগুলির মত পাতা ছাড়চে, ফুল ফোটাচ্চে—ডাঁটা ফলাচ্চে—কে এসে ভোগ করবে? সন্ধ্যার ধূসর আকাশ—দু-চারটে তারা—'জনতার মাঝে জনগণ পতি' গানটাও আবার মনে এল—আকাশের তারাদের দিকে চাইলেই ওইঅপূর্ব ভাবটা হয়।

তারপর উঠে ওদের বাড়ি গেলাম। মন্মথদের বাড়ি সভা হল। আমায় করলে সেক্রেটারী। সভা ভঙ্গের পরে বিভূতি গলা জড়িয়ে ধরে বললে, এখানে রাত্রে খেয়ে যাবেন। তারপরে লাল ঘরে অনেকক্ষণ আড্ডা হল। পড়বার ঘরে তারপরে বিভূতিকাছে বসে খাওয়ালে। পুরানো দিনের গল্প হল, সব চেয়ে কথা উঠল—'পুত্তলিকা' 'পুত্তলিকা', সে কথা হল। তারপর রিক্সা করে মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-রাত্রে পুরনোদিনের মত বাসায় ফিরলাম—সেই প্রতাপ ঘোষের বাড়ির সামনে দিয়ে, থানাটার পাশদিয়ে। একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েচি, আজ বিকালে প্রবাসী আফিসেও Sir P. C.. Roy-এর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম।

রবিবারে প্রসাদ এল। বেশ মাথায় বড় হয়েচে—সেই ছোট্ট প্রসাদ আর নেই। তাকেদেখে এমন স্নেহ একটা হল! আমার নাম উঠলেই এখনও সকলে কাঁদে—চাঁপাপুকুরেরবড় মাসিমা কাঁদেন, এই সব কথাও বললে। একটা চাকরির কথা বললে। তারপর আমার নাম এখন প্রায়ই সকলে করেন, সে কথাও বললে। তারপর সে চলে গেল।

আমি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি, নীরদবাবু এসে ডাকচেন। দুজনে দমদমা গেলাম—সুশীলবাবু শান্তিকে পড়াচ্ছিলেন—দুজনেই বাইরে এলেন। গল্পগুজব হল—মাঠে বসেচা খাওয়া গেল। আমরা পাঁচটার সময়ে বেরিয়ে শরদিন্দুবাবু ও করুণাবাবুর পার্টিতে এলাম। নরেন দেব, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্যাল, রমেশ বসু—সবাই এল। খুব খাওয়া দাওয়া হল। প্রচুর খাওয়া! নরেন দেব সন্দেশ খেতে খেতে মুখ লাল করে ফেলে অবশেষে যখন আরও খেতে অনুরুদ্ধ হলেন—মরীয়া হয়ে বললেন, সন্দেশটা ভালোনয়। আমরা বেরিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে এসে সুশীলবাবুকে তুলে নিয়ে

নীরদবাবুর গাড়িতে নিউ মার্কেটে গেলাম। কথা রইল বৃহস্পতিবারে 'অপরাজিত' পড়া হবেদমদমার বাগানবাড়িতে। Wide world কিনে রাতে বাসায় ফিরলাম।

কিন্তু আজই মনটা কেমন উড়ু উড়ু, মায়ের সেই সজনে গাছটা—ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ির কথা আজ সারাটা দিন মনে হয়েছে—বিশেষ করে এই জ্যোৎস্না রাত্রে।

এবার সরস্বতী পূজা একটু দেরিতে। কিন্তু ছুটি পাওয়া গেল বেশি। সপ্তাহব্যাপীছুটি। 'অপরাজিত' প্রায় শেষ হয়ে আসচে—ভাবলাম একবার কেওটা যাবো এসময়ে। নীরদবাবুও রাজী। গত মঙ্গলবার আমি ও নীরদবাবু মোটরে গেলাম দমদমা। সুশীলবাবু যেতে পারবেন না, অতএব আমরা সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে দক্ষিণেশ্বর যাবো বলে বেরিয়ে পড়ি। সুশীলবাবুর স্ত্রীও 'অপরাজিত' শুনবেন বলে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সবাই বেরিয়ে পড়া গেল কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হল না। যশোর রোডের 'পরে একটা নিভৃত বাঁশবনের ছায়ায় বিছানা পেতে বসে আমরা 'অপরাজিত' পড়লাম—তারপর ফিরে এসে চা খেয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। রাত্রে রমেশবাবুর ওখানেনেমন্তন্ন ছিল—সেখানে প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে দেখা।

বুধবার দিনটি কাজ করলাম। বৃহস্পতিবার সকালে বনগ্রামের ট্রেনে চাপলাম—বঙ্কুদের বাসায় পৌঁছে দেখি তরু নেই। হেডপণ্ডিতকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে অঞ্জলি দিলাম।দেবেনের বাসায় গেলাম, তারপর ফিরে এসে তরুর সঙ্গে গল্পগুজব করে চাল্‌কীরওনা।

কি অদ্ভুত আমের বউলের সৌরভ, কি শিমুলফুলের শোভা। বাতাবী লেবুফুলেরগন্ধ। কাল পয়লা ফাল্গুন, এমন বসন্তশোভা আমাদের দেশে অনেক-কাল দেখিনি। চাল্‌কী পৌঁছে খাবার খেয়ে খুকী, ভোঁদো সবসুদ্ধ উত্তরমাঠে বেড়াতে গেলাম—রস খাওয়া গেল—অনেকটা বেড়ালাম। তারপর ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি আবার গেলাম উত্তর মাঠে—তখন চারিধার কি নির্জন।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুরে গেলাম। সারা পথে কেমন দক্ষিণা হাওয়া—কিঅপূর্ব আমের বউলের গন্ধ! খুকীও সঙ্গে গেল। সকাল সকাল ফিরে স্নান করলাম।তারপর বৈকালে বেরুতে যাবো, বৃষ্টি এল—একটু বসলাম। আবার যাবো—রামপদএল। তাকে একটু জল খাইয়ে দুজনে একসঙ্গে বার হওয়া গেল। কি অপূর্ব শান্তিরমধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছলাম। আমি পট্‌পটিতলায় ঘাটের এপারে এসে দাঁড়ালাম—ওপারের রাঙা-রোদভরা মাঠের দৃশ্যটা কি যে অপরূপ! তারপর মাঠের পথ বেয়েআমাদের বাড়ির পিছনের পথে আসচি, বেলা পড়ে এসেচে—কি বাঁশের শুকনো খোসাও ঝরা বাঁশপাতার সুঘ্রাণ!...কতকাল আগের শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয় যে।

রামপদর কাছে বসে একটু তামাক খেয়ে ও গল্পগুজব করে শ্যামাচরণদাদার বাড়িএলাম। সেখানে অপেক্ষা করলাম। জ্যোৎস্না উঠলে চাল্‌কী চলে এলাম। ছেলেপিলেরাএল গল্প শুনবে বলে। বঙ্কু অনেকক্ষণ ছিল।

আজ সকালে উঠে চলে এলুম।

কাল বিকালে সুশীলবাবুদের বাড়ি গেলাম। কি সুন্দর বসন্ত এবার এখানে! বৃষ্টিনেই। দেশে গিয়েছিলাম—সর্বত্র আমের বউলের গন্ধ। আজ সকালে সজনীর বাড়িগেলাম—স্নান সেরে। বেজায় কুয়াশা। সজনীর স্ত্রী চা ও লুচি খাওয়ালেন। বড় ভালোমেয়েটি।

'অপরাজিত'র শেষ লেখাটা আজ প্রেসে দিয়ে এসেচি। কিছু করবার নেই। হাতও মন একেবারে খালি। স্কুল থেকে ফিরে নিউ মার্কেটে গিয়ে 'Wide World'খুঁজেপেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রীটে এসে কাপড় কিনে এই ফিরচি।

'অপরাজিত'র শেষটা ভাল করে লেখবার জন্যে তিনদিন ছুটি নিয়েছিলাম। একটাজিনিস লক্ষ্য করলাম—ছুটি ভাল লাগে না। স্কুলটাই ভাল লাগে। বেশ ছেলেপুলে নিয়ে থাকা—অমিয়, দেবব্রত, বিমলেন্দু, সত্যব্রত এদের সঙ্গ

বেশ লাগে। ওরা সবাইশিশু—নীচু ক্লাসের ছেলে। আমাকে মাস্টার বলে ভয় তত করে না, যতটা আপনারলোকের মত ভালবাসে। সব বিষয়ে সাহায্য চায়, troubles খুলে বলে, বেশ লাগে।ওদের নিয়ে সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, টেরই পাই না। নিষ্ক্রিয়, Death-in-Life ধরনের existence-এর চেয়ে এরকম স্কুল মাস্টারীও শতগুণে শ্রেয়।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। আজ সকালে উঠে সজনী দাসের বাড়িতে চলে গেলাম, নাখেয়েই—সে এ কয়দিনই অবশ্য যাচ্ছি। কিন্তু আজ গেলাম 'অপরাজিত'র শেষ ফর্মার প্রুফ দেখবার জন্যে। ওখান থেকে স্কুলে। সেখানে দেবব্রতের পরীক্ষা নিলাম।তারপর ইউনিভার্সিটির সামনে সুধীরদার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হল—সমীর বললে ভালো লিখেচে। শৈলেনবাবুরসঙ্গেও দেখা হল। তারপর এক কাপ চা খেয়ে আবার গেলাম সজনী দাসের ওখানে। প্রমথবাবু ও সজনী বসে। শেষ ফর্মাটা প্রেসে ছাপতে দিয়েচি। তারপরে কি করে 'পথের পাঁচালী' প্রথম মাথায় এল, সে গল্প করলাম।

আজ তাই মনে হচ্ছে, সত্যিই স্মরণীয় দিনটা। ১৯২৪ সালের পূজার সময়টা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সব সময়ই এই বই-এর কথাই ভেবেচি। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে১৯৩২-এর ১০ই মার্চ পর্যন্ত এমন একটা দিনও যায়নি, যখন আমি এ বইখানির কথা না ভেবেচি—বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মনোভাব নোট করেচি,মনে রেখেচি—কত কি করেচি। ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরের বড় বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধ-ভরা ফাল্গুন-দুপুর, কত চৈত্র-বৈশাখের নিমফুলের গন্ধ-মেশানো অলস অপরাহ্ণ, বড়বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি—অপু, দুর্গা, পটু, সর্বজয়া, হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েচি। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দুখানির খুব যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমারজীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এ বিষয়ে ভুল নেই— কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা-ভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে,তারাই জানে সর্বজয়ারসবখানি আমার মা নন।

আজ রাত অনেক হল। এদের সকলের উদ্দেশে বইখানি উৎসৃষ্ট করলাম। যদিসাহিত্যের বাজারে আন্তরিকতার কোনো মূল্য থাকে, তবে আমার ইসমাইলপুরে, ভাগলপুরে বড়বাসার ছাদে আমার বহু বিনিদ্র রজনীযাপনের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেবে যে, বই দুখানি লিখতে আন্তরিকতার অভাব আমার ছিল না বা চিন্তার আলস্য আমি দেখাইনি।

আজ সত্যিই কষ্ট হচ্চে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরেআমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল। আজ ওবেলাও প্রুফ দেখেচি, অদলবদলকরেচি—কিন্তু এবেলা থেকে তাদের সকলকেই সত্যসত্যই বিদায় দিলাম। আজ রাত্রে যে কতখানি নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করচি, তার সন্ধান তিনিই জানেন, যিনি কখনোএমনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে গুটিকতক চরিত্র সম্বন্ধে সর্বদা ভেবেচেন।—তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুরুদুরু বক্ষে চিন্তা করেচেন।

অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি।তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করচি—তবে সে ছিল অনেকখানিই আমারনিজের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যে বেশি কষ্ট হচ্চে বিদায় দিতে কাজলকে, লীলাকে, দুর্গাকে, রাণুদিকে—এরা সত্যসত্যই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। কোনোদিকে এদের কোনো ভিত্তি নেই এক আমার কল্পনা ছাড়া।

যদি দু-পাঁচজনেরও এতটুকুভাল লাগে বই দুখানা—তবে আমার পাঁচ বৎসরেরপরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করবো।

সত্যিই মনে পড়ে ইসমাইলপুর থেকে সাবোরে আসচি ঘোড়ায় ভাবতে ভাবতে—নোট করতে করতে। কার্তিক আগুন জ্বাললে সাবোর স্টেশনে। সে জিনিস আজ শেষহল? যখন 'পথের পাঁচালী' ছাপা হয়েছিল, তখনও 'অপরাজিত' ছিল—বেশিটাই বাকিছিল—কিন্তু আজ আর কিছু নেই।

রাত্রি অন্ধকার। চাঁদ ডুবে গিয়েচে। শহরের গোলমাল থেমেচে। আমি লিখতেলিখতে বহু দূরে অন্ধকার আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে দেখচি—জীবনদেবতার কি ইঙ্গিত, যেন আগুনের আখরে আকাশের অন্ধকারপটে লেখা।

বিদায়, বন্ধুদল—বিদায়।

আজ সকালে মহিমবাবু এসে অনেকক্ষণ বসেছিল। তারপর স্কুল থেকে গেলামইউনিভার্সিটিতে Examiners' Meeting-এ। বেরিয়ে আমি ও সুনীতিবাবু দুজনে গেলামলিবার্টি অফিসে। টমসন সাহেব সেদিন এলবার্ট হলের বক্তৃতায়'পথের পাঁচালী'রউল্লেখ করেছেন—নীহার রায়ের মুখে শুনে একখানা কাগজ আনিয়ে নিলাম। তারপরবাসে উঠে সজনীর বাড়ি। সেখান থেকে ফিরে Sample কাগজখানা দেখা এইমাত্র শেষকরলাম। স্কুলে দেবব্রত খাতা দেখাতে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ওবেলা—তাকে বললাম, তুই আমার ছেলে তো?

সে বললে একটু সলজ্জ হেসে—হ্যাঁ। ও কখনো একথা বলে নি এর আগে। তাই আজ আনন্দে মনটা পূর্ণ আছে সারাদিন।

আজ রাত্রে 'অপরাজিত' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডটা সজনীর কাছ থেকে আনলাম।আজ সকালেই বই বার হয়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত বসে থেকে চা খেয়ে ও গল্প-গুজবকরে চলে এলাম।

দ্বিজরাজ জানা মারা গিয়েচে বলে সকালে ছুটি হল। বেরিয়ে আমি যতীনবাবু ওক্ষেত্রবাবু ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ও নিউ মার্কেটে বেড়ালাম। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি গেলাম কাগজের খোঁজে। কাগজ পেলাম না। বীরেনবাবুও ছিল। বেরিয়ে বাসায় এসে একটু ঘুমুনো গেল।

এখন রাত। সিঁদুরে মেঘ হয়েচে। মনটা কেমন একটা বিষাদে পরিপূর্ণ—মনটা শূন্যহয়ে গিয়েচে—অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, কাজল, লীলা, পটু, বিনি—এরা সব আজ মনেরবাইরে চলে গিয়েচে, কতকালের সহচর-সহচরী সব—সেই ইসমাইলপুরে এমন সব চৈত্র অপরাহ্নেWide World-পড়া দিনগুলো থেকে ওরা আমার মনের মধ্যে ছিল—কাল একেবারে চলে গিয়েচে।

ওদের বিরহ অতি দুঃসহ হয়ে উঠেচে।

এর আগে ক'দিন মনটা ছিল নিরানন্দ। কেবল গৌরীপুরের মাঠে যেদিন Picnic করতে যাই আমরা—সেদিনটাতে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই আধ-জ্যোস্না আধ-আঁধাররাত্রে তালবনের ধারে পুকুরপাড়ে বসে কত কি গল্প—কতকাল ওসব কথা মনে থাকবে।

কাল রাত্রে সাহিত্য-সেবক-সমিতিতে সভাপতি ছিলাম। অচিন্ত্য একটা গল্প পড়লে—গল্পটা মন্দ হয়নি—সেখান থেকে বেরিয়ে অনাথভাণ্ডারের থিয়েটার দেখতে যাবো কথাছিল, কিন্তু অবনীবাবু, সুকুমার ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে জমে গিয়ে রাত এগারোটা পর্যন্তহৃষিকেশ লাহাদের বাড়ির সামনের পার্কটাতে আড্ডা দিলাম। সেখান থেকে বার হয়েবাসায় ফিরলাম অনেক রাতে।

আজ বেলা চারটার ট্রেনে শ্রীরামপুরে গেলাম। সেখানে 'আনন্দপরিষদের' অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে হবে। ছেলেরা ওখান থেকে এসেছিল। অবনীবাবুকে সঙ্গে নেববলে ডাকতে গেলাম, পেলাম না। ঝম্-ঝম্ করচে দুপুরের রোদ। কিন্তু একটু পরেবেশ মেঘ করে এল। শ্রীরামপুরে শ্রীলীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে গেল।লীলারানী

দেবী লেখিকা, 'কল্লোল' ও 'উপাসনা'য় লেখেন। ওপরের বারান্দাতে তিনি বরফ দিয়ে শরবত তৈরী করে খাওয়ালেন ও জলখাবার দিলেন। তার সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এঁদের বাড়ির কাছেই খুকীর শ্বশুরবাড়ি। একবার সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ছিল। লোকও পাঠালাম—কিন্তু লোক ফিরে এসে বললে কারুর সঙ্গে দেখা হল না।

সভায় যখন আসচি—ওদের বাড়িটা দেখলাম—ভাঙা দোতলা বাড়ি—একটা কয়লার গোলার পাশ দিয়ে পথ। সভার কার্য শেষে আবার ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা। সমবেতভদ্রলোকেরা আমাকে একটা বড়লোকের বাড়ির দোতলার হলে নিয়ে গেলেন—সেখানেই একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে নানারকম ফলমূল, মিষ্টান্ন, শরবত সাজানো।এত খাই কি করে? এই শ্রীলীলারানী দেবীর ওখান থেকে খেয়ে আসচি। কে সে কথাশোনে? আনাতোল ফ্রাঁসের Procurator of Judea গল্পটি খেতে খেতে ওঁদের কাছে করলুম—রসের বৈচিত্র্য ও quaintness হিসেবে।

ওরা ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। ট্রেনে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল—বাড়ি জিরেট-বলাগড়, বিড়ি খাওয়ালে, অনেক গল্প-গুজব করলে। হাওড়া স্টেশন থেকে হেঁটে বাসায় এলাম। পথে পানিতরের বামনদাস দত্তের সঙ্গে দেখা। আজ পয়লা মে! একটা স্মরণীয় দিন। আজকার সভার জন্যে বা এসব আদরের জন্যে নয়—আজ ১৩ বৎসর হতে সেই ১লা মে-তে—কিন্তু সেকথা আমিই জানি, আর কেউ জানে না। জানবার কথাও নয়। বলবও না কাউকেও।

বেশ হাওয়া, বাসায় এসে বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে রইলাম।

আজ মনে একটা অপূর্ব আনন্দ পেলাম—অনেক কাল পরে। মনে পড়ে গেল বাল্যে দুপুরে আহার সেরে এই সব দিনে বাড়ির পেছনে বাঁশবনে মুখ ধুয়ে আসতাম। বাঁশবনে গিয়ে আঁচালে তবে মনে একটা আনন্দ আসত—কত তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু একদিন ও থেকে কি গভীর আনন্দই পেয়েছি!...সেই ভিটে, সেই গ্রাম আজও তেমনিআছে—আমিই কেবল বদলে গিয়েচি। আজ রবিবার ফণিকাকারা তাড়াতাড়ি করচে এত রাত্রে হরি রায়ের বাড়িতে তাস খেলতে যাবে বলে—আনন্দ করচে ঝিটকীপোতার বাঁওড়ে বড় রুই মাছের বাচ হচ্চে বলে—হাটে আজ মাছ সস্তা হয়েচে বলে—আমিও যদি গ্রামে থাকতুম—আমিও ও-থেকে আনন্দ পেতুম ওদেরই মতন—কিন্তু আমি বদলে গিয়েছি একেবারেই। Sophisticated হয়ে পড়েচি, hampered হচ্চি। দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট হয়নি বলে এখনও এসব বুঝতে পারি।

আকাশের অগণ্য তারায় তারায় কত দেবলোক, কত পৃথিবী, কত জগৎ—কতঅগণিত প্রাণীকুল, কত দেবশিশু—আনন্দের কি মহান, অসীম ভাণ্ডার! দুঃখও যত বৃহৎ তাদের—আনন্দও তত বৃহৎ। এই ভেবেই, চৈতন্যের এ প্রসারতা শুধু আমার আজ রাত্রে।

আজ সকালে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ কাল অনেক রাত্রে দম্‌দম্‌ থেকেফিরেচি। সেখানেই রাত্রে খেলাম, আগামী রবিবারে Outing-এর নক্সা করলাম, তারপর আমি আর নীরদবাবু মোটরে ফিরেছি। আজ এইমাত্র সাহেবের ওখান থেকে আসছি।সাহেব একটু দমে গিয়েচে—আমি ফণিবাবুর সঙ্গে ওটা মিটিয়ে ফেলতে বললুম।

কনভেন্ট রোডটা অন্ধকার, এখানে-ওখানে যুঁই ও মালতীর সুগন্ধ, আজ আকাশবেশ পরিষ্কার, নক্ষত্রে ভরা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম সাহেবের হাঙ্গামাটা যেনমিটে যায়।

একটা কথা মনে হচ্চে। মানুষের মনের ব্যাপকতা যত বাড়বে ততই সে পূর্ণ মনুষ্যত্বকে লাভ করবে। এমন সব মানুষ জীবনে কতই দেখলাম, তাদের মনের সতর্কতা, চৈতন্যের ব্যাপকতা বড়ই কম। এত কম যে আহার-বিহার ও অর্থোপার্জনেরবাইরে যে আর কিছু আছে, তা তারা ভাবতে পারে না। জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, আর্টবল, সাহিত্য বল—এ সবের কোনো মূল্য নেই তাদের কাছে। এমন কি স্নেহ, প্রেম, কল্পনা, বন্ধুত্ব, এ সবও তাদের অজ্ঞাত—

loyalty-কে তারা ভীরুতা ভাবে, স্নেহকে দুর্বলতা ভাবে। ফণিবাবু একজন এই ধরনের মানুষ। এ সব লোকের নির্বুদ্ধিতা আমি বরদাস্ত করতে পারি নে একেবারেই। মূর্খতারও একটা সীমা আছে, এদের তাও নেই।

সে যাক্। এই চৈতন্যের ব্যাপকতার কথা বলছিলাম। এই মুক্ত প্রকৃতি, সবুজ ঘাসে-মোড়া ঢালু নদীতীর, কাশবন, শিমুলবন, পাখির ডাক—নীল পর্বতমালা, অকুলসমুদ্র, অজানা মহাদেশ—এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, সুন্দরী তরুণী, স্নেহময়ী পত্নী, উদার বন্ধু, অসহায় দরিদ্রদল,—এই বিরাট মানবজাতির অদ্ভুত ইতিহাস, উত্থানপতন, রাজনীতির ও সমাজনীতির বিবর্তন, এই বিরাট নক্ষত্রজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কা—জানা-অজানা জাগতিক শক্তি,—এই X-ray, বিদ্যুৎ, invisible rays, high penetrating radiation,—ওই মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যুপারের বিরাট জীবন—এই রহস্যে স্পন্দমান, অসীম, অদ্ভুত জীবনরহস্য—এই সৌন্দর্য, এই বিরাটতা, এইকল্পনার মহনীয়তা,—এসবে যারা মুগ্ধ না হয়, গরু-মহিষের মত ঘাস-দানা পেলেই সন্তুষ্ট থাকে, যারা এই রহস্যময় অসীমতার সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিদ্রিত ও উদাসীন রইল—সে হতভাগ্যগণ শাশ্বত ভিখারী—তাদের দৈন্য কে দূর করতে পারবে?

মানুষের মত যত উদার হবে, যত সে নিজের চৈতন্যকে বিশ্বের সবদিকে প্রসারিতকরে দিতে পারবে, অণুর চেয়ে অণু, মহানের চেয়েও মহান, বিশ্ববস্তুর প্রতি আত্মবুদ্ধিকে যত জাগ্রত করে তুলতে পারবে—সে শুধু নিজের উপকার করবে না, নিজের মধ্য দিয়ে সে শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকারজাল ও জনতাকে প্রতিভার ও দিব্যদৃষ্টির আলোকে প্রসারিত করে দিয়ে যাবে। সেই সত্য—সত্য নিত্যকালের মশাল্‌চি।

সেদিন চারু বিশ্বাসের বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং হল। রাত দশটার পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে আসতে গিয়ে লাউডন স্ট্রীটের মোড়ে একটা টায়ার গেলফেটে। মৌলালীর মোড়ে আবার মহরমের বেজায় ভিড়। অনেক কষ্টে রাত্রে বাড়ি পৌঁছলাম। ভোরে স্নান সেরে বসে আছি নীরদবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। চা পান করে দম্‌দম্ থেকে বেরুনো গেল। বনগাঁর পথে এ গাড়িরও একখানা টায়ার গেল। বনগাঁয়ে পৌঁছে বাজার করে বেলেডাঙ্গা পৌঁছুতে বেলা নয়টা। বটতলায় গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে সবাই মিলে রেঁধে খেলাম। শ্যামাচরণদাদাদের বাড়ি এলাম—সেখান থেকে নৌকা করে নকু-দুলের ঘাট পর্যন্ত বেড়ালুম—সবাইপুরের ঘাটে স্নান করলুম। তারপরে সেদিনরাত্রে দম্‌দমাতে ফিরে খেয়ে আবার এলুম বাসাতে।

এবার বাড়ি গিয়ে বড় গোলমাল। ক'দিন বেশ কেটেছিল, শ্যামাচরণদাদার স্ত্রীর স্নেহবড় উপভোগ করেচি—বৌদি বড় ভাল মেয়ে—আমার শ্রদ্ধা হয়েচে। বর্ষা-বাদলারদিনে পুঁটিদিদিদের বাড়ি গরু-বাছুরের সঙ্গে একঘরে বাস করে মনটা খিঁচড়ে উঠেছিল।ওখানে এবার তুফন্ ঠাকরুন মারা গেলেন। আসবার আগের দিন তাঁর শ্রাদ্ধ হল।রোজ বিকেলে বকুলতলায় বসতুম। জগা ছড়া বলত—

"অশন বসন রণে সদা মানি পরাজয়,

দুনয়নে বারিধারা গঙ্গা যমুনা বয়—

কথায় কথায় তুমি যেতে বল যমালয়," ইত্যাদি।

ছেলেমানুষের মুখে বেশ লাগত।

কিছুদিন কলকাতা গিয়ে রইলাম। একদিন নীহার রায়ের ওখানে গেলাম, সেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব বসে আছে, 'অপরাজিত' সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল। নীহার বললে—'অপরাজিত' একটা Great Book, আমি এঁদের সেই কথাই বলছিলাম, আপনি আসবার আগে। ধূর্জটীবাবুর বাড়িতে একদিন 'অপরাজিত' নিয়ে আলোচনাহল আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক অনেক জায়গা দাগ দিয়ে পড়েচেন, মার্জিনে নোট লিখে।তারপর নীরদের বাড়িতে চা-পার্টি উপলক্ষে সুনীতিবাবু ও রঙীন্ হালদারের সঙ্গে সেসম্বন্ধে অনেক কথা হল।

রবিবারে গেছলাম, আবার পরে রবিবারে ফিরি। সেদিন রাণাঘাটে নেমে কি ভয়ানক বর্ষা। গোপালনগরে নামলাম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। অতি কষ্টে গাড়ি যোগাড়করে ফিরলাম। হাটবার, সুশীলবাবু একটা মোট পাঠিয়েছিলেন শ্যামাচরণদাদাদের জন্যে—সেটা তাঁদের দিলাম।

কাল খুব গুমোট হয়েছিল। বৈকালে জেলি, সরলা এরা পড়তে এল—বকুলতলায় চেয়ার পেতে বসে খুকুর সঙ্গে খুব গল্প করলুম। রিমঝিম বর্ষার মধ্যে মেঘভরাআকাশের তলা দিয়ে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলাম। ওপারে বর্ষাস্রোত বয়, গাছপালা, সবুজ তৃণভূমি—বৃষ্টিতে চারিধারে ধোঁয়া-ধোঁয়া—তারপর গেলাম ওপাড়ার ঘাটে। জলগরম—নেমে স্নান করতে করতে চারিদিকে চেয়ে সে কি আনন্দ পেলাম—মাথারউপর উড়ন্ত সজল মেঘরাশি, জলের রং কাকের চোখের মত, কি সুন্দর কদম গাছটাররূপ—মনে হল ভাগলপুরের সেই অপূর্ব সবুজ কাশবনের চর—সুদূরপ্রসারী প্রান্তরেরসেই সুন্দর প্রাণ-মাতানো স্মৃতিটা—সেও এমনি বর্ষা-সন্ধ্যা, এমনি মেঘেভরা আকাশ—হাতির পিঠে চড়ে আমীনের সঙ্গে সেই বেড়ানোটা। আমি জলে সাঁতার দিলাম। মনেহল আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা—এই মুহূর্তে পাখা ছেড়ে এই মেঘ-ভরা আকাশ চিরে ওপারে বহুদূরে কোথায় উড়ে যাবো!

এমন আনন্দ সত্যিই অনেকদিন পাইনি।

এখনও সোঁদালিফুল আছে—কিন্তু এবার অতিরিক্ত বর্ষায় অনেক অনিষ্ট করেচে—অনেক ফুলই ঝরে পড়ে গিয়েচে। সোঁদালিফুল এত ভালবাসি যে ঘাটে নাইবার সময় ঘাটের ধারে সে গাছগুলো আছে, সেদিকের ফুলের ঝাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকি—নইলে যেন প্রাণের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। দু-এক ঝাড় যা আছে, তাদেরও চেহারা বড়শ্রীহীন। কি করি, ওদের নিয়েই যা একটু আনন্দ পাই!..

আগের দিন জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে বেলেডাঙ্গার মাঠে গিয়েছিলাম। এ দিন বৃষ্টিছিল না, সুন্দর মাঠ তৃণাবৃত, সোঁদালিফুল এখনও গাছে গাছে খুব। দুটি রাখাল ছেলেরসঙ্গে কতক্ষণ বসে গল্প করলাম, মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়ালাম, নদীজলে সন্ধ্যায় নাইতে নেমে সাঁতার দিলাম খুব। মোড়টা ফিরতে কুঠির পথে একটা ঝোপের মধ্যেএকটা ডালে কি ফুল ফুটে আছে—বাল্যজীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়—এক সময়েএরাই ছিল সহচর, এদের সব চিনি।...

রোজ খেয়ে উঠে মুখ ধোবার সময় খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশতলার দিকেযাই। ঐ সময়টা বহু পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে যেন—পুরাতন বাল্য-দিনগুলিপ্রতিদিন ঐ সময়টাতে ফিরে আসে।

এখনও গ্রীষ্মের ছুটি এবার শেষ হয়নি। পরশু পর্যন্ত আছে। কিন্তু খুলবার সময় হয়েচে। মনটা বড় খারাপ হয়ে আসচে। কত কথা যে মনে আসচে—কত গ্রীষ্মের ছুটি এ রকম করে কাটল। অথচ দেশে তো আমার কেউ নেই—যখন ছিল সে ছিল আলাদাকথা।...

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসটা বড় বর্ষা। যখন বাঁশতলী গাছে আম পেকে টুক্‌টুক্ করছে, যখন যুগল কাকাদের চারা বাগানে আম পাকচে—তখন বর্ষার আকাশ এমন ঘন মেঘাচ্ছন্ন, যেন শ্রাবণ মাস কি আষাঢ় মাস। যে সময়ে কলেজে পড়বার সময়ে আমি বেলেডাঙ্গার পথের বটতলার শান্ত আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার নিরাশ্রয়তার মধ্যে চলে আসতুম, খুব কষ্ট হত। এবারে কিন্তু কত দিন পর্যন্ত আমি রইলাম! কি সুন্দর বর্ষাদৃশ্য এবার দেখলাম ইছামতীর চরে, ইছামতীর কালো জলের ওপরে! কি বড় বড় মেঘেরছায়া!...ঘাটের পথে খেজুর গাছটায় খেজুর এখনও বোধ হয় খুঁজলে দু-একটা পাওয়াযাবে।

ওদের নিয়ে রোজ পাঠশালা করতুম, খুকু sentence লিখত, জগা ছড়া বলতো:—

‘এঁতল বেঁতল তামা তেঁতল

ধরতো বেঁতল ধরো না’—

কি মানে এর, ও-ই জানে—অথচ কি উৎসাহেই আবৃত্তি করত।...শিবু ও সুরোধনুকবাণ নিয়ে যাত্রা করতে আসত, খুকু কত রাত পর্যন্ত বসে আমার কাছে গল্প শুনত, —জ্যোৎস্না উঠে যেত তবুও সে বাড়ি যেতে চাইত না। এক একদিন আবার দুপুরেএসে বলত, গল্প বলুন। আসবার দিন বকুলতলায় বসে ওকে খাতা বেঁধে দিলাম, sentence করতে দিয়ে বলে এলাম, এসে আবার দেখব।

"মায়ের ভাঙা কড়াখানা উল্টে পড়ে গিয়েছে, ভিটেটাতে বড় বেশি জঙ্গলহয়েছে—অপু" যেমন বইতে লিখেচি।

কুঠির মাঠে গিয়ে এক-একদিন গামছা পেতে শুয়ে থাকতুম—খুব হাওয়া, বড় চমৎকার লাগত। কিন্তু যখন ইছামতীর জলে নাইতে নামতুম সকালে ও বিকেলে—সেই সময়ই সকলের চেয়ে লাগত ভালো। ও-পাড়ার ঘাটের সামনে সবুজ ঢালু ঘাস ভরা মাঠ ও আঁকাবাঁকা শিমুলগাছটা যেকি অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলত চোখেরসম্মুখে তা কাকে বলি, কে-ই বা বুঝবে? যখন আসি তখনও বৌ-কথা-ক' ছিল, তখনও পাপিয়া, কোকিল ডাকত, অথচ তখন তো আষাঢ় মাস পড়েই গিয়েছিল।

এবার এ-বাড়ি ও-বাড়ি এত নিমন্ত্রণ সবাই করে খাইয়েছে—কেন জানি না, অন্যবারএত নিমন্ত্রণ তো করে না।

দেবব্রতকে কত কাল দেখিনি—তার মুখ ভুলেই গিয়েছি—এতকাল পরে এইবার দেখব।

সেদিন বনগাঁয়ে গেছলাম—সকালে খুকীর সঙ্গে পাকা রাস্তায় সাঁকোয় কত খেলাকরলুম। খুকী কত ফল তুললে, পাতা তুললে, আমিও কত ফল পেড়ে নিয়ে এসেছিলাম; খুকী রাঁধলে। খুকীর সঙ্গে ছেলেমানুষী খেলা খেলে ভারী আনন্দ পাই[3]। খুকী কিন্তুপড়াশুনো করে না, এই ওর দোষ। খুকু এর মত নয়, খুকু খুব বুদ্ধিমতী, পড়াশুনোয়খুব ঝোঁক।

বনগাঁয়ে সেদিন বোটের পুলে বিশ্বনাথ, দেবেন, সরোজ সবাই বসে গল্প করছিল, আমি যেতে অনেকক্ষণ বসে গল্প হল, বিশ্বনাথ নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালে।রাত্রে এই দিন বঙ্কুর বাসায় খাওয়ার পরে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে বেড়াতে বনগাঁ স্কুলেরফটকে ঠেস দেওয়ানো বেঞ্চিটার ওপর গিয়ে বসলাম। কত কথা মনে আসে! চব্বিশবছর আগে একজন বারো বছরের ক্ষুদ্র বালক একা বাড়ি থেকে ভর্তি হতে এসে ওইজায়গাটাতে লাজুক ভাবে চুপ করে বসেছিল—কতকাল আগে। সেদিনে আর আজকারমধ্যে কত তফাত তাই ভাবি। হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে বেড়িয়ে এলাম— বোর্ডিং-এর সব ঘরের সামনে বেড়ালাম। কিন্তু পর পর সেদিনের কথাটা মনে আসছিল— একটি ছোট ছেলে বর্ষার জলা ও আষাঢ়-শ্রাবণের আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙে এক-গাকাদা মেখে চাদর গায়ে, মায়ের কাছ থেকে ভর্তি হওয়ার সামান্য টাকা ও দুটি পয়সা জলখাবারের জন্যে বেঁধে এনে লাজুক মুখে চুপ করে ওই স্কুলের পৈঠার উপর বসেআছে—এমন মুখচোরা যে, কাউকে বলতে পারছে না ভর্তি কোন্ ঘরে হয়, বা কাকে বলতে হবে?

সেই ছোট ছেলেটি চব্বিশ বছর আগেকার আমি—কিন্তু সে এত দূরের ছবি যেআজ যেন তার ওপর অলক্ষিতে স্নেহ আসে।

ওঃ, এবার যেন ছুটিটা খুব দীর্ঘ মনে হচ্চে। সেই কবেকার কথা, সুশীলবাবুর স্ত্রীবটতলায় ভাত রেঁধে আমাদের পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন, আমরা কাঠ কুড়িয়েছিলাম, যুগল এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছিল—সে কত দিনের কথা। তারপর গোপালনগরেরবারোঁয়ারী, তুফন্ ঠাক্‌রুণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, সে সবও কতকালের কথা। বড় চারারআম কেনা, মাঠের চারার আম কেনা, সে সবও আজকার কথা নয়। আঁচানোর সময়েখুড়িমাদের বাড়ির পিছনে গাছপালা ও বাশবনের দৃশ্যটা এত অদ্ভুত যেন একেবারেশৈশবে নিয়ে যায় এক মুহূর্তে।

---

[3]খুকু এবং খুকী এক নয়—খুকু থাকে বারাকপুরে আর খুকী থাকে বনগাঁয়।

জীবনের রূপ ও সৌন্দর্যে ডুবে গেলাম। হে ভগবান! এর তুলনা দিতে পারিনে।

পঞ্চানন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হল, ইউনিভার্সিটির একটি brilliant ছেলে, রেবতীবাবুর বন্ধু। পথে আসতে আসতে অবনী ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা। তারা মনোজের বাড়ি কাঁঠাল খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেচে। বৃষ্টি আসচে দেখে আমি দৌড় দিলাম।

বাসায় এসে ঠিক করলুম এই ঘরটা আমি একলা নেব। এ বৎসরটা খুব পড়ব, লিখব, চিন্তা করব। Prescott's Peru, Shackleton's Voyages ও Historiography-র ভালো বই এবার পড়তে হবে—যদিও Prescott আমার পড়া আছে, তবু আর একবারপড়ব। চিন্তায় যে নির্জনতা চাই, তা ঘরে একা না থাকলে হবে না। Crystallography সম্বন্ধে কিছু পড়তে হবে।

এ কয় মাস এই খাতাখানা হারিয়ে গেছল। তাই মাস পাঁচেক ধরে এতে কিছু লেখা হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খাতাখানা ছিল আমার বাক্সটাতে, সে বাক্সটাকতবার খুঁজেচি খাতাখানার জন্যে, তবু সন্ধান পাইনি। আজ পালিতদের তারাপদবাবুএলেন সন্ধ্যার সময়ে। তাঁদের সেই ঠিকুজী-কুষ্ঠীখানা আমার কাছে অনেক দিন পড়েআছে, তাই ফিরিয়ে নিতে এলেন। বাক্স খুলে ঠিকুজীখানা খুঁজতে খুঁজতে এ খাতাখানাও বার হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে—এই পাঁচ মাসের মধ্যে—আমার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে।সব দিক থেকে পরিবর্তন। জ্ঞান মারা গিয়েচে, ওর সংসার পড়েচে আমার ঘাড়ে, জীবন ছিল দায়িত্বহীন, অবাধ—এখন আমি পুরোদস্তুর ছা-পোষা গেরস্ত মানুষ। বনগাঁয়েবাসা করে ওদের সব সেখানে এনে রেখেছি। সেটাযখন আমার কর্তব্য, তখন তাআমায় করতেই হবে, স্বার্থপর হতে পারব না কোনদিন।

আরও পরিবর্তন হয়েচে। ক্লারিজ সাহেব চলে গিয়েচে, দেবব্রত চলে গিয়েচে। কোথায় গিয়েচে, বা দেবব্রতের কি হয়েচে তা আমি লিখব না। কিন্তু আমার মনে যে ব্যথা লেগেচে এতে—ভেবে দেখবারও অবকাশ পাইনে সব সময়। এক-একবারগভীর রাত্রে মনে পড়ে, ঘুম আসে না চুপ করে থাকি—অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি—সে ব্যথা বড় সাংঘাতিক—যাক্ ও-কথা আর লিখে কি হবে!

সেদিন শিবরাত্রি গেল। এই শিবরাত্রির সঙ্গে আমি সেদিন বসে বসে হিসেব করেদেখছিলাম যে, জীবনের কত সুখ-দুঃখের কাহিনীই না জড়িত রয়েচে! মধ্যে একদিনএসেছিল বনগাঁয়ের হরবিলাস—নৃপেন রায়ের নতুন কাগজের জন্যে, (তার নাম আমি আজই করে এসেছি 'উদয়ন')—তাকে বললুম—তোমাদের বাসাটা আমায় দেবে? আমি গভীর রাত্রে বসে বসে ভাবছিলাম, তা যদি হয়, ওরা যদি বাসাটা ছেড়ে দেয়—তা হলে সেখানে কি করে বাস করব? কত কথাই না মনে পড়বে! মনে পড়বে আমিযখন বালক, কিছুই বুঝি নে—বনগাঁয়ে হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের বেতের বিভীষিকায়দিনরাত কাঁটা হয়ে থাকি—সেই সব দিনের কথা। সেই এক শিবরাত্রি—কিন্তু না, তারআগেও শিবরাত্রির কথা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত আছে। ছেলেবেলায় হালিসহরথেকে সেই যে এসেছিলাম—ছোট মামা প্রভাতী গান করত বৈষ্ণবদের সুরে—আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে নদী থেকে নেয়ে আসতুম—জীবনের সেই প্রথম শিবরাত্রি যার কথা মনে আছে। তারপর অবিশ্যি বনগাঁয়ের ঐ শিবরাত্রি। ওঁরা এসে বাইরের ঘরথেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন মন্ত্র পড়াতে—বেশ মনে আছে। তাই ভেবেছিলাম এতকাল পরে—জীবনের এত অদ্ভুত পরিবর্তনের পরে আবার হরবিলাসদের বাসায়থাকব কেমন করে?

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাই জানি না। আট মাসবেঁচেছিল—কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্পদিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি? ওআপন মনে হাসত—কিন্তু সবাই বলত "আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কেতোমার হাসি দেখচে?"—ওর অপরাধ—ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল।সত্যিই ওর হাসি

কেউ চাইত না। ওর বাবা তো মারা গেল; ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউ দেখত না—ওর খুড়িমা বললে—টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকোলতলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠোনে—আমার কষ্ট হত কিন্তু আমি কি করব? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারি নে?ওর রিকেটস্ হল। দিন দিনশীর্ণ হয়ে গেল—তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাসায় বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাসত—সেদিনও তেমনি হাসতে দেখে এসেছি—ও-শনিবারেযখন বাড়ি থেকে আসি।Unwanted smile! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়েগিয়েচেগত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিনদেখেচি—এ ছাড়াআর কোন চিহ্ন কোথাও রেখে যায়নি ও। Poor Little mite! কিন্তুআমি বলি ও হাসি শাশ্বত,—এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটুফুলের দলে ফুটেচে, ফুলেফুলেকত কাল ধরে ফুটে আসচে—কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবনধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীনও নিত্য—খুকীর হাসিও তেমনি।

পার্ক সার্কাস থেকে ট্রামে আসতে আসতে তারাভরা নৈশ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেচে—এই ঘূর্ণ্যমান, বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, এই সৃষ্টিমুখী নীহারিকার প্রজ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের রাশি—এই অনাদ্যন্ত মহাকাল—এরা যেমননিত্য, যতটুকু নিত্য, যে অর্থে নিত্য, তার চেয়ে কোন অংশে কম নিত্য নয় আমারঅবোধ, অসহায়, রোগশীর্ণ খুকীর দন্তহীন কচিমুখের অনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন, অকারণ হাসিটুকু। বরং আমি বলচি তা আরও বড়—এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন একটা বিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম নীতি আছে, উদীয়মান সবিতার রক্তরাগের মত তা অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকলসৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে—এইজন্য অর্থযুক্ত করে যে, যে গৌরবে সৃষ্টির সৌন্দর্য রূপপেয়েচে, মহিমময় হয়েছে— সেই বর্ণ সবিতার দান, আদিম অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা বসুন্ধরারমুখের আবরণ অপসারিত করেছেন সবিতা তাঁর আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে—তাকেসার্থক করেচেন, জাগ্রত করেচেন, মাটির মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকীর হাসি সবিতার ওই অমৃতজ্যোতির মত, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা বিশ্বের জড়পিণ্ডেপ্রাণের সঞ্চার করে, বিপুল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে, গৌরবময় করে।

তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়,—তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা সম্ভব হয়েচে সৃষ্টিরওই অধ্যাত্মনীতির আইনে—ও নীতি অমোঘ—ওর শক্তি ও ওর সত্য, অস্তিত্ব অন্তরতম অন্তরে অনুভব করতে পারি কিন্তু ভাষায় বোঝানো যায় না।

[4]বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙামাটির টিলার গায়ে। চারিধার কত নিঃশব্দ—আকাশ কেমন নীল—অনেকদিন এমন মনেরআনন্দ পাইনি কলকাতার মুমূর্ষু নিস্তেজ মন কাল সারা রাত ও আজ সারাদিনেরমাঝে বন্য-সৌন্দর্য দেখে, প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশ বনের ও ধাতুপ ফুলের প্রাণবন্ত রূপ দেখে—ইব্‌সেনের অরণ্য-নদী-পর্বত সমাচ্ছন্ন বিরাট পটভূমির দৃশ্যে একমুহূর্তে তাজা হয়ে উঠল—কি ঘন শাল-পলাশের বন—কি সুন্দর জনহীন প্রান্তর, দূরে দূরে নির্জন পর্বতমালা—মন অভিভূত হয়ে পড়ে কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে মাথা সতেজ হয়ে ওঠে। রোদ কি অপূর্ব রাঙা হয়ে এসেচে—স্টেশনের পাশের পথটা দিয়ে সোমড়ার হাটথেকে সাঁওতালী মেয়েরা হাট করে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে যাচ্চে। হাটটায় এইমাত্র আমি, প্রমোদবাবু ও কিরণবাবু বেড়াতে গিয়েছিলাম—বেগুন, রেড়ির বীজ, কচি ইঁচড়, চিংড়ি, কুমড়ো, খই, মুড়ি বিক্রি করচে। এক জায়গায় একটি সাঁওতালী যুবতী ধান দিয়ে মুড়কী নিচ্চে। এই হাটের সামনে একটা প্রাকৃতিক জলাশয়ে আমরা স্নান করলুম। ভারী আনন্দ পেয়েচি আজ—ভাগলপুর ছেড়ে আসবার পরে এত আনন্দ সত্যই অনেককাল পাইনি।

---

[4]সম্বলপুর।

রোদের রাঙা রং অতি অপূর্ব!

ডাকবাংলো থেকে লোক জিজ্ঞেস করতে এসেচে আমরা রাত্রে কি খাব।

[**]সকালে আমরা রওনা হলাম। পথে কি সুন্দর একটা পাহাড়ী ঝরনা। সিরসিরকরে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেচে। কতকগুলি লোক একটা কাঠের পুলের ওপর খড় বিছিয়ে দিচ্চে। তারা বললে, পাটোয়ারীর ছেলে এ-পথে চলে গিয়েচে। পাহাড়ী করবীর দল জলের ধারে ফুটে রয়েচে। শান্ত শাল-পলাশের বনের ছায়া। এখানের সবাইউড়িয়া বুলি বলচে। এমন ভাল লাগে!

নীল আকাশের তলে অফুরন্ত বাঁশের জঙ্গল। শাল-পলাশের বনে রোদ ক্রমে হলদে হয়ে আসচে। প্রিণ্ডোলা থেকে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে ৭/৮ মাইল পথ হেঁটে দুপুরে বিক্রমখোলে পৌঁছলাম। বিক্রমখোলের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরেউত্তীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েচে—তাই দেখবার জন্য আমরা এখানে এসেচি। লেখাটাভারী চমৎকার জায়গায়—একটা Limestone-crag-এর নীচে ছায়াভরা জায়গায়প্রাকৃতিক ছোট একটা গুহা মত—তারই গায়ে লেখাটা। চারিধারের বন যেমন গভীরতেমনি সুন্দর—পথের মধ্যে জঙ্গলে কত ধরনের গাছ। আমলকী ও হরিতকীর বন—আমরা আমলকী ফল কুড়িয়ে খেতে খেতে এলাম। প্রিণ্ডোলা গাঁয়ের পাটোয়ারী আমাদের জন্যে মুড়কী ও দুধ নিয়ে এল। উড়িষ্যার এই গভীর জঙ্গলে সেই প্রাগৈতিহাসিকযুগের শিলালিপি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেচে।

জায়গাটা অতীব গভীর অরণ্যময়—কি অপূর্ব নীল আকাশঅরণ্যের মাথায়— কিঅপূর্ব নিস্তব্ধতা...পাহাড়ের crag, তার ছায়ায় আমরা কতক্ষণ বসে রইলাম—ছেড়েযেতে আর ইচ্ছে করে না—ইচ্ছা হয় না যে আর বেলপাহাড়ে ফিরি। আবার গাড়িতেউঠি। আবার কলকাতায় যাই।

প্রিণ্ডোলা নামে একটা গাঁ পাহাড়ের পাদদেশে—এইখান দিয়ে বিক্রমখোল যেতে হয়। আমরা বেলা দশটার সময় এখানে পৌঁছলাম। একটু পরেই পাটোয়ারী গাড়ি করে এল। গাঁয়ের 'গাঁউঠিয়া'অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের নাম বিস্বাধর—সে তাড়াতাড়ি আমাদের জন্য দুধ ও মুড়কী নিয়ে এল খাবার জন্যে। একটু বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলাম—দেখাশুনো করে ফিরে আবার গাঁয়েই এলাম। ওবেলাকার নাচের দল নাচ দেখালে। আমরা একটা ফটো নিলাম। আমাদের কোন অদৃষ্টপূর্ব জীব ভেবেএখানকার লোকেরা ঝুঁকে পড়েচে—দলে দলে এসে আমাদের চারিপাশে দাঁড়িয়েচে।প্রমোদবাবু মুখে সাবান মেখে দাড়ি কামাচ্ছে—এরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে—এ দৃশ্য আর কখনো দেখেনি বোধহয়। ফটোগ্রাফ নেবার সুবিধের জন্য নাচ হল পথেরওপর—ঝন্-ঝন্ করচে রোদ—নাচওয়ালীদের মুখের ওপর বড় রোদ্দুর পড়েচে দেখেআমি পরিমলবাবুকে তাড়াতাড়ি snapটা সেরে নিতে বললুম।

নাচ গান শেষ হল। প্রমোদবাবু, পরিমলবাবু ও কিরণ হেঁটে রওনা হলেন বেলপাহাড়ে।আমার পায়ে ফোস্কা পড়েচে বলে হাঁটতে পারা গেল না। গরুর গাড়িতে ওঁদেরজিনিসপত্র নিয়ে আমি ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হলাম। দেখলাম—আর্যাবর্তেরসমতলভূমি বাদে ভারতের সবটাই এই ধরনের ভূমি। B.N.R.-ই দেখ না কেন—সেইখড়গপুর থেকে আরম্ভ হয়েচে রাঙামাটি, পাহাড় ও শালবন—আর বরাবর চলেচে এইচারশ মাইল—এর পরও চলেচে আরও চারশ মাইল—চারশ মাইল কেন, আরওআটশ মাইল বম্বে পর্যন্ত। অরণ্যের দৃশ্য সেখানে যেতে আরও গম্ভীর—সহ্যাদ্রিরমহিমময় ঘাটশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যের তুলনা কোথায়। ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি—মালাবার উপকূলের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট—আর্যাবর্তের সমতলভূমি পার হয়েই অতুলনীয়হিমালয়, Alpine meadows, ভারতের প্রকৃত

[**]বিক্রমখোলের পথে

রূপই এই—এই রাঙামাটি, পাহাড়, শালবন—এই আসল ভারতবর্ষের রূপ। বাংলার সমতলভূমিতে সারা জীবন কাটিয়েআমরা ভারতের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারিনে। অবশ্য বাংলার রূপ অন্য রকম, বাংলাকমনীয়, শ্যামল, ছায়াভরা। সেখানে সবই যেন মৃদু ও সুকুমার—গাছপালা থেকে নারী পর্যন্ত। এ সব দেশের মত রুক্ষভাব ওখানে তো নেই!

মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। কি জ্বলজ্বলে নক্ষত্রগুলো—যেন হীরের টুকরোরমত জ্বলচে! ...বিরাট— বিরাট— প্রকৃতি এখানে শিবমূর্তি ধরেচে। কমনীয় নয়, সুষ্ঠুনয়, কিন্তু উদার, মহিমময়, বিরাট। বিরাট is the term for it।

হঠাৎ খুকীটার কথা মনে পড়ে গেল। ওর সেই অবোধ, অনাদৃত হাসিটুকুর কথা মনে পড়ল। এই বিরাট প্রকৃতি, ওই নক্ষত্রজগৎ, বিশাল উদার Space-এর মধ্যে ওরস্থান কোথায়? মরে সে কোথায় গেল? তার ক্ষুদ্র জীবনীশক্তি নিয়ে ও কি এদেরবিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত? Poor mite, what chance had she—a helpess thing!

কিন্তু বনের ওই হলদে তিলের ফুলের থোকা—প্রথম বসন্তে যা থোকা থোকা ফুটেচে—তা দেখলে মনে আশা জাগে। আমি বলতে পারি—এই বিরাটতার সঙ্গেমঙ্গল মিশে আছে, এই মহিমময় সন্ধ্যায় আত্মার সত্যদৃষ্টি খুলে যায়। বুদ্ধি দিয়ে সেজিনিস বোঝা যায় না, তর্কযুক্তির পথে তা ধরা দেয় না—তা প্রাণের মধ্যে আপনাআপনি ফুটে ওঠে, নির্জন ধ্যানের মধ্যে দিয়ে—অপূর্ব আনন্দের মধ্যে দিয়ে। মুখে বলেসে সব বোঝনো কি যায়?

ফিরে দেখি ডাকবাংলোতে ওরা আসেনি। আমি একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম।সামনে চাঁদ উঠেচে নক্ষত্র জ্বলচে। অনেকক্ষণ পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে। আমি একটা শালপাতার পিকা আনিয়ে খেলাম।

সারারাত্রি আমরা গল্প করে জাগলাম। শেষ রাত্রে আমি কয়েকবার উঠে এসে এসেবাইরে দাঁড়ালাম—চাঁদ দূরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত গেল। রাঙা হয়ে গেল চাঁদটা—অদ্ভুত দেখতে হয়েচে!...

অনেক রাত্রে আমরা স্টেশনে এলাম। বেজায় শীত। ভোরবেলার দিকে ট্রেনটাএল। রাতে কি কষ্ট—মালের বস্তার ওপর বসে বসে ঢুলছিলাম—পরিমলবাবুকেজায়গাটা ছেড়ে দিলাম।

ভোর হল কুলুঙ্গা স্টেশনে। কি অপূর্ব পর্বতের ও জঙ্গলের দৃশ্য। এমন wilderness আমি খুব কমই দেখেচি। যে স্টেশনে আসি—সেইটাই মনে হয় আগেকার চেয়ে ভাল।নোটবুকে বসে বসে নোট করি, কি কি সেখানে আছে। গোইলকেরা স্টেশনটি বড় সুন্দরলাগল। শাল জঙ্গল, পাহাড়, স্থানটাও অতি নির্জন। বাংলাদেশের কাছে যত আসি ততই সমতল প্রান্তর বেশি। খড়গপুরের ওদিকে কলাইকুণ্ডা জায়গাটি এ হিসাবে বেশভাল।

বাংলাদেশে গাড়ি ঢুকল। তখন বেলা একেবারে চলে গেছে। এ আর এক রূপ, অতি কমনীয়, শান্ত শ্যামল। চোখ জুড়িয়ে যায়, মন শান্ত হয় কিন্তু এর মধ্যে বিরাটত্বনেই, majesty নেই—হৃদয় মন বিস্ফারিত হয় না, কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠে অসীমতার দিকে ছুটে চলে। এতে মনে তৃপ্তিআসে—ছোটখাটো ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথাভাবায়, নানা পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—মানুষ যা নিয়ে ঘরকন্না করতে চায় তারসব উপকরণ জোগায়। হাসি অশ্রু মাখানো লজ্জাবনতা পল্লীবধূটি যেন— তার সবইমিষ্টি, কমনীয়। কিন্তু মানুষের মন এ ছাড়া আরও কিছু চায়, আরও উদ্দাম, অশান্ত, রুক্ষ, রুদ্র ভাব চায়। বাংলাদেশে তা যেন ঠিক মেলে না। হিমালয়ের কথা বাদ দি— সেটা বাংলার

নিজস্ব একচেটে জিনিস নয়—আর তার সঙ্গে সত্যিকার বাংলার সম্বন্ধই বা কি? পদ্মা?...সেও অপূর্ব, সন্দেহ নেই—কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনীবধূ, একগুঁয়ে, তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী, যা-খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না—সবাই ভয় করেচলে—খামখেয়ালী—রূপবতী—তবে মিষ্টি নয়—high-bred রূপ ও চালচলন। ঘরকন্না পাতিয়ে নিয়ে থাকবার পক্ষে তত উপযোগী নয়।

কলকাতা ফিরে পরদিনই নীরদবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ হল সন্ধ্যায়। আমার আবার একটু দেরি হয়ে গেল। সুশীলবাবু মাঝের দিন আমার বাসায় এসেছিলেন—বঙ্গশ্রী আফিসে আমায় Phone করেছিলেন—যাবার সময় পার্ক সার্কাস থেকে ওঁরবাসা হয়ে গেলাম। সতীশের সঙ্গে একটা আফিমের দোকানে আজ আবার দেখা হল। কদিন ধরেই উড়িষ্যা ও মানভূমের সেই স্বপ্নরাজ্য মনে পড়চে বিশেষ করে মনে পড়চে আসানবলী ও টাটানগরের মধ্যবর্তী সেই বনটা—যেখানে বড় বড় পাথরেরচাঁই-এর মধ্যে শালের জঙ্গল—পত্রহীন দীর্ঘ গাছগুলিতে হলদে কি ফুল ফুটে আছে—কেবলই ভাবচি ওইখানে যদি একটি বাংলো বেঁধে বাস করা যায়—ওই নির্জন মাঠ বন, অরণ্যানীর মধ্যে।

অপরাহ্ণে ও জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে তাদের রূপ ভাবলেও মন অবশ হয়ে যায়।

সকালে উঠে দীনেশ সেনের বাড়িতে এক বোঝা পরীক্ষার কাগজ পেশ করেএলুম। সারা পথে মুচুকুন্দ চাঁপার এক অদ্ভুত গন্ধ! বিজয় মল্লিকের বাগানে একটাগাছে কেমন থোকা থোকা কাঁচা সোনার রঙের ফুল ধরেচে। বড় লোভ হল—ট্রামথেকে নেমে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বললাম—ঐ গাছতলাটায় একবার যেতে পারি? সে বললে—নেহি। সংক্ষেপে বললে, আমায় সে মানুষ বলেইমনে করলে না। আবার বললুম—দু'একটা ফুল নিয়ে আসতে পারিনে?তলায় তোকত পড়ে আছে। সে এবার অত্যন্ত Contemptuous ভাবে আমার দিকে চেয়ে পুনরায় সংক্ষেপে বললে—নেহি।

ভাল, নেহি তো নেহি—গড়ের মাঠে খিদিরপুর রোডের ধারে অনেক মুচুকুন্দফুলের গাছ আছে, ট্রামে আসবার সময় দেখে এসেচি, সেখান থেকে কুড়িয়ে নেব এখন।

তারপর এলাম নীরদবাবুর বাড়ি। সেখানে খানিকটা গল্পগুজব করে গেলাম শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ি। পাশের বৈঠকখানায় রমাপ্রসাদবাবু আছেন দেখলাম—শ্যামাপ্রসাদবাবুও তাঁরলাইব্রেরী ঘরে কি কাজ করছিলেন। সেখানে খানিকটা থাকবার পরে বাসায় ফিরলাম।

বৈকাল বেলা। আজ রামনবমী। কতদিনের কথা মনে পড়ে। বৈকালে বসে বসে তাই ভাবছিলাম—বেলা পড়ে এসেচে—কত পাপিয়ার ডাকভরা এই সময়ের সেই পুরাতন দুপুরগুলো।...বাঁশের শুকনো পাতার কথা কেন এত মনে হয়, তা বুঝতে পারিনে। সুভদ্রাকে কাল যখন পত্র লিখলুম—তখনও বাঁশবনের কথা ও শুকনো পাতাররাশির কথাই মনে এল। পাপিয়ার গানের কথা বিশেষ করে মনে আছে। এই সবদিনের অতীত দুপুরগুলোর সঙ্গে পাপিয়ার গান জড়ানো আছে, আর জড়ানো আছেঅদ্ভুত ধরনের wild আনন্দ!...

বেলা পড়ে এসেচে। গোঁসাই পাড়ার নারকোলতলায় আজও তেমনি মেলা বসেচে, অতীত দিনের মত। বাদা ময়রা মুড়কি ও কদ্‌মা বিক্রী করচে, গোপালনগর থেকেহয়তো যুগল ও হাজরা ময়রা তাদের তেলেভাজা জিবে-গজা ও জিলিপীর দোকাননিয়ে এসেচে।

বাবার সেই শ্লোকটা—অনেক কালের সেই আমবনের ছায়ায় উচ্চারিত শ্লোকটাআজও আমার মনে আছে। পুরনো খাতাখানা আজও আছে, নষ্ট হয়নি।

সকালবেলা। নেড়াদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে এসেচি।

বাস্তবিকই গ্রামের লোকের সংকীর্ণতা এত বেশি—মনকে বড় পীড়া দেয়, এদের মনচারিধার থেকে শৃঙ্খলিত—খুলবার অবকাশ নেই। আবালবৃদ্ধ-বনিতার এই দশা দেখচি।এদের আচার শুষ্ক ও সৌন্দর্যবর্জিত—স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

কাল বিকেলে নদীর ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ একলা বসে ছিলাম। বাংলাদেশের, বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের প্রকৃতির এই যে সৌন্দর্য—এ অন্য ধরনের। কিছুদিন আগে আমি উড়িষ্যায় গিয়ে সেখানকার বন-পাহাড়ের সৌন্দর্যের কথা যা লিখেছিলাম—এখানে বসে মনে মনে বিচার করে দেখে আমি বুঝলাম তার অনেক কথা আমি ভুল লিখেছিলাম। বাংলার সৌন্দর্য more tropical—এখানে অল্প একটু স্থানের মধ্যে যতবিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা ও লতা আছে—ওসব দিকে তা নেই। এখানে বৈচিত্র্য বেশি।নীল আকাশ ওখানেও খোলে—মনে অন্যরকম ভাব আনে, তা মহনীয়, বিরাট—এ কথা ঠিকই। কিন্তু বাংলার আকাশ—বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কি গ্রাম্য নদীর উপরকার যে আকাশ—তার সৌন্দর্য মনে অপূর্ব শিল্পরসের সৃষ্টি করে—মনে বৈচিত্র্য আনে। হয়তো বিরাটতা নেই, ঠিকই—কিন্তু Poetry of Lifeএতে যেন বেশি। বাঁশগাছে ও শিমুলগাছে এ দেশের, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের, সৌন্দর্যকে এক অভিনব রূপ দিয়েচে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এর সঙ্গে গ্রামে জোটে কচি উলুবন ও আউশ ধানের ক্ষেত। এত সবুজের সমাবেশ আর কোথাওদেখিনি—a feast of green—তবে গ্রামের মধ্যে মুক্ত আকাশ বড় একটা দেখা যায় না,—ওই একটা দোষ। বড় চাপা। কিন্তু মাঠে, নদীর ধারে—মুক্তরূপা প্রকৃতি যেমনি লীলাময়ী তেমনি রূপসী। উদার প্রান্তর, উদার আকাশ—নানাবর্ণের মেঘের মেলা অস্তদিগন্তে, সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মেঘ-চাপাগোধূলির আলোয়, গাছেপালায়, শিমুলগাছের মাথায়, নদীজলে, উলুখড়ের মাঠে কিযে শোভা!...

একথা জোর করে বলতে পারি বিক্রমখোলের পাহাড় ও বনের ওপারে যে আকাশদেখেছিলাম—মাধবপুরের চরের ওপারের বৈকালের আকাশ তার চেয়ে মনে অনেকবেশি বিচিত্রভাবের সৃষ্টি করে।

এইমাত্র নাগপুর শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী মালভূমিতে মোটরে বেড়িয়ে ফিরে এলাম।একথা ঠিকই যে বাংলার রূপ যতই সুন্দর হোক, বিরাটতায় ও গম্ভীর মহিমায় এসব দেশের কাছে তা লাগে না। উড়িষ্যার বন-পাহাড়ের সৌন্দর্যের চেয়েও এর সৌন্দর্যবিরাট ও majestic। বাংলাদেশের রূপ নিতান্তই নিরীহ পল্লীবধূর মত লাবণ্যময়ী, লাজুক টিপ-পরা ছোট্ট মুখটি। কিন্তু এদেশের highland-এর রূপ গর্বদৃপ্ত সুন্দরীরাজরানীর মত।

"Pure Logical thinking can give us no knowledge whatever of the world of experience. The knowledge of Reality begins with experience and terminates with it. Reason gives the structure to the system and the data of experience and their mental relations are to correspond exactly with the consequences in the theory."

Einstein,

Herbert Spencer Lecture, Oxford, 1933.

Lucian's Satires,

Celsas (178 A.D.) writes :

"Christians are like a council of frogs in a marsh. Their Teachers are mainly weavers and cobblers, who have no power over men ofeducation and taste. The qualification for conversion are ignorance,and childish timidity. Like all quacks they gather a crowd of salaves, children, women and idlers."

Senecca—Economy,

"He is born to serve but few, who thinks only the people of his own age. Many thousands of years, many generations of menare yet to come : look to these, though from some cause silence has beenimposed on all of your own day; then will come those who may judge without offence and without favour."

[আমি 'অপরাজিত'র এক স্থানে অবিকল এই ভাবই ব্যক্ত করেচি। অনেক পূর্বেই করেচি—তখন তো আমি সেনেকার এ উক্তিগুলি পড়িনি—কিন্তু কি চমৎকার মিলআছে!]

অনেকদিন লিখিনি, মনেও ছিল না। হঠাৎ আজ মনে হল তাই সামান্য এতটুকুলিখে রাখলাম। আজকার তারিখটা অন্তত খাতায় থাকুক।

আজ বৈকালে নাগপুর এসে পৌঁছেচি। এবার পুজোয় এখানেই আসবো ঠিক করে রেখেছিলাম। আজ সারাদিন গাড়ির ঝাঁকুনিতে বড় কষ্ট হয়েচে। গত মাসকয়েক আগেযে বেলপাহাড়ে এসেছিলাম সে স্টেশনটা আজ রাতে—শেষ রাতে বেরিয়ে চলে গেছে, দেখতে পাইনি। বিলাসপুর পর্যন্ত তো বেশ এলাম। বিলাসপুর স্টেশনে আমরা চাখেলাম। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুর পর্যন্ত প্রায় একই একঘেয়ে দৃশ্য—সীমাহীন সমতলভূমি এক চক্রবালরেখা থেকে অন্য চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত। দৃশ্য বড় একঘেয়ে, প্রায়ই ধানের ক্ষেত ও জলাভূমি—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শালবন। রাঙামাটিও সব জায়গায় নেই। বেলপাহাড়ের মত পাহাড় ও জঙ্গল এ পথে কোথাও নেই—এক ডোঙ্গরগড় ছাড়া। ডোঙ্গরগড় ছাড়িয়ে তিন-চারটা স্টেশন পর্যন্ত দৃশ্য ঠিক আমি যা চাই তাই। উভয় পাশে ঘন অরণ্য, শাল, খয়ের ও বন্যবাঁশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, পর্বতমালা। উড়িষ্যার বনের চেয়েও এ বন অধিকতর গভীর কিন্তু এইটুকু যা, তারপরআবার সেই একঘেয়ে সমতলভূমি—নাগপুর পর্যন্ত। বাংলাদেশে এত অনন্তপ্রসারী দিকচক্রবালদেশের কল্পনাও করতে পারা যায় না।

এই সব স্থানে জ্যোৎস্নারাত্রে ও অল্পরাত্রে যে অদ্ভুত দেখতে হবে তা বুঝতেপারলাম—তবু মনে হল বনভূমির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য যা বাংলাদেশে আছে, তা এসবঅঞ্চলে নেই। বাংলার সে কমনীয় আপন-ভোলানো রূপ এদের কৈ? এখানকার যারূপ তা বড় বেশি রুক্ষ। অবশ্য ডোঙ্গরগড় স্টেশন ছাড়িয়েই যে পাহাড় পড়ে—এমনঅনাবৃত শিলাস্তূপ, অত গম্ভীরদর্শন উন্নতভূমি বাংলার কোথাও নেই একথা ঠিক—কিন্তু বাংলায় যা আছে, এখানকার লোকে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

বৈকালে নাগপুরে কোতোয়াল সাহেবের বাংলোয় এসে উঠলাম। তারপর চা খেয়ে আমি প্রমোদবাবু বেড়াতে বেরুলাম। শহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটা বড় পাহাড় আছে, শালবনে আবৃত, নীচে দিয়ে মোটরের পথ আছে। দুজনে সেখানে একটা শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলাম। হাওয়া কি সুন্দর। দুজন ভদ্রলোক পথে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের চেহারা দেখে আমার মারহাট্টি সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের কথা মনে পড়ল।

সন্ধ্যাতারা উঠেচে। পাহাড়ের বনভূমি অন্ধকার হয়ে এল।দূরে বনের মাথার দিকে চেয়ে দেখলাম—ওদিকে সাতাশ মাইল প্রান্তর, অরণ্য, নদী পার হয়ে তবে বারাকপুর।হাটবার, আজ রবিবার, সন্ধ্যা হয়েচে, কাঁচিকাটার পুল দিয়ে গণেশ মুচি হাট করেফিরচে, আর বলতে বলতে যাচ্চে—হাটে বেগুন আজ খুব সস্তা।

—এত জায়গা থাকতে ও জায়গার কথা আমার এত মনে হয় কেন?

আর মনে পড়ে আমাদের পোড়ো ভিটের পশ্চিম ধারের সেই কি অজানা গাছগুলো, যার সঙ্গে বাল্য থেকে আমার কত পরিচয়—ওগুলোর কথা মনে কল্পনা করলেইআবার আমার বারো বছরের মুগ্ধ শৈশব যেন ফিরে আসে।

কাল বৈকালে এখানকার মহারাজবাগ ও মিউজিয়াম দেখলাম। মিউজিয়ামে অনেক পুরনো শিলাখণ্ড আছে—কয়েকটি খ্রীস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর। বিলাসপুর জেলায় একটা ডাকাতের কাছে পাওয়া কতকগুলো তীর দেখলাম, ভারী কৌতূহলপ্রদ জিনিসবটে। একটি জীবন্ত অজগর সাপ দেখা গেল। মহারাজবাগে একটা বড় সিংহ আছে, কিন্তু সে-সব যতই ভাল লাগুক, সে-সব নিয়ে আজ লিখব না। আজ যা নিয়ে লিখতে বসেচি, তা হচ্ছে আজকার বিকেলের মোটর ভ্রমণটি।

নাগপুর শহরের চারিধারে যে এমন অদ্ভুত ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিশিষ্ট স্থান আছে সে-সব কথা আমি কখনও জানতুম না। কেউ বলেওনি। শহরের উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপরকার রাস্তা দিয়ে আজ আমরা মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম। যোধপুরী ছাত্রটি আমাদের নিতে এসেছিল। সে যে কি অপূর্ব সৌন্দর্য, তা লিখে প্রকাশ করতে পারিনে। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অস্তদিগন্ত রঙে রঙে রঙীন। বহুদূরে, দূরে, উচ্চ মালভূমিরসুদূর প্রান্ত সান্ধ্যছায়াচ্ছন্ন, দিক্‌চক্রবালরেখা নীল শৈলমালায় সীমাবদ্ধ, সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে যেদিকে চাই, ধু-ধু বৃক্ষহীন, অন্তহীন উচ্চাবচ মালভূমি, শৈলমালা, শিলাখণ্ড,—দু-চারটা শালপলাশের গাছ। মাথার উপর অপূর্ব নীল আকাশ, ঈষৎ ছায়াভরা, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে—পিছনের পাহাড়টি ক্রমে গাড়ির বেগে খুব দূরে গিয়েপড়চে, তার ওপরকার বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসচে—সামনের শৈলমালা ফুটে উঠছে—ক্রমে অনেক দূরে সিতাবলডির পাহাড় ও বেতার টেলিগ্রাফের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। তার নীচে চারিদিকের মালভূমি ও পাহাড়ে ঘেরা একটা খাঁজের মধ্যে নাগপুর শহরটা। এমন একটা মহিমময় দৃশ্যের কল্পনা আমি জীবনে কোনদিনই করতে পারিনি—বাংলাদেশ এর কাছে লাগে না—এর সৌন্দর্য যে ধরনের অনুভূতি ও পুলক মনে জাগায়, বাংলাদেশের মত ভূমিসংস্থান যে সব দেশে, সে সব দেশের অধিবাসীদের পক্ষে তা মনে কল্পনা করাও শক্ত। উড়িষ্যার দৃশ্যও এর কাছে ছোট বলে মনে হয়—সেখানে জঙ্গল আছে, বুনো বাঁশের ঝাড় আছে বটে, কিন্তু এ ধরনের অবর্ণনীয় সুমহান, বিরাট, রুক্ষ সৌন্দর্য সেখানকারও নয়। তখন আমি এসব দেখিনি, কাজেই উড়িষ্যাকেইভেবেছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চরমতম সৃষ্টি। আমি বনশ্রী খুব ভালবাসি, বনথাকলে আমার চোখে সে সৌন্দর্য সৌন্দর্যই নয়—কিন্তু বন না থাকলেও যে এমনঅপূর্ব রূপ খুলতে পারে, এমন Superb অনুভূতি মনে জাগাতে পারে তা আমারধারণাও ছিল না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেচে। এখানে পাহাড়ের ওপর দুটো বড় হ্রদ আছে, একটার নাম আম্বাজেরী আর একটার নাম কি বললে যোধপুরী ছাত্রটি ঠিক বুঝতে পারলাম না।দুটোই বড় সুন্দর—অবিশ্যি আম্বাজেরী হ্রদটা অনেক বড় ও সুন্দরতর। হ্রদের সামনে কলকাতার ঢাকুরে লেককে লজ্জায় মুখ লুকাতে হয়। এর গম্ভীর মহিমার কাছে ঢাকুরিয়া লেক বাল্মীকির কাছে ভারতচন্দ্র রায়। এর কি তুলনা দেব? ম্লান জ্যোৎস্নাউঠল। যোধপুরী ছাত্রটি লোক ভাল, কিন্তু তার দোষ সে অনবরত বকচে। প্রমোদবাবুতার নাম রেখেচেন 'মুলো'—সে চুপ করে থাকলে আমরা আরও বেশি উপভোগ করতে পারতুম।

আসবার পথটিও বড় চমৎকার—পথ ক্রমে নেমে যাচ্চে—দুধারে সেই রকম immensity। মনে হল আজ পূজার মহাষ্টমী—দূর বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতেএখন এই সন্ধ্যায় মহাষ্টমীর আরতি সম্পন্ন হয়ে গেছে, প্রাচীন পূজার দালানে নতুন জামা-কাপড় পরে ছেলেমেয়েরা মুড়ি-মুড়কি, নারকোলের নাড়ু কোঁচড়ে ভরে নিয়েখেতে খেতে প্রতিমা দেখচে। বারাকপুরের কথা, তার ছায়াঘেরা বাঁশবনের কথাও এ সন্ধ্যায় আজ আবার মনে এল। সজনে গাছটার কথাও—সেই সজনে গাছটা।

মহাষ্টমীতে আজ ক্র্যাডক্-টাউনে প্রবাসী বাঙালীদের দুর্গোৎসব দেখতে গিয়েছিলাম।নাগপুরে বাঙালী এত বেশি তা ভাবিনি; ওরা প্রসাদ খাবার অনুরোধ করলে—কিন্তুনীরদবাবুকে রুগ্‌ণ অবস্থায় বাসায় রেখে আমরা কি করে বেশিক্ষণ থাকি?

মারাঠী মেয়েরা রঙীন শাড়ি পরে সাইকেলে চেপে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। আমরা মহারাজ বাগের মধ্যের রাস্তা দিয়ে এগ্রিকালচারাল কলেজের গাড়িবারান্দার নীচে দিয়ে ভিক্টোরিয়া রোডে এসে পৌঁছুলুম। রাত সাড়ে সাতটা, জ্যোৎস্না মেঘে ঢেকে ফেলেচে।

সেদিন বনগাঁয়ে ছকু পাড়ুইর নৌকাতে সাতভেয়েতলা বেড়াতে গিয়েছিলাম—এবার বর্ষায় ইছামতী কূলে কূলে ভরে গিয়েচে—দুধারের মাঠ ছাপিয়ে জল উঠেচেতারই ধারের বেতবন, অন্যান্য আগাছার জঙ্গল বড় ভাল লেগেছিল। অত সবুজ, কালো রংয়ের ঘন সবুজ, —বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না, বনের অত বৈচিত্র্য ও রূপ কোথাও নেই— নীল আকাশের তলায় মাঠ, নদী, বনঝোপ বেশ সুন্দরলেগেছিল সেদিন। কিন্তু আজ মনে হল সে যত সুন্দর হোক, তার বিরাটতা নেই—তাpretty বটে, majestic নয়।

চারিধারে জঙ্গলাবৃত—গাছপালার মধ্যে হ্রদটা। হ্রদের বাংলোতে বসে লিখচি।প্রমোদবাবু বলচেন, সূর্য ঢলে পড়েচেশীগ্‌গির লেখা শেষ করুন। এখান থেকে আমরাএখন রামটেক্ যাব। কি গভীর জঙ্গলটাতে এইমাত্র বেড়িয়ে এলাম—বুনো শিউলি, কেঁদ, আবলুস, সাঁইবাবলা সব গাছের বন। সামনে যতদূর চোখ যায় নীল পর্বতমালাবেষ্টিত বিরাট হ্রদটা। এমন দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেচি। পাহাড়ে যখন মোটরটাউঠল—তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করবার নয়। সময় নেই হাতে, তাই তাড়াতাড়ি যা-তা লিখচি। সূর্য ঢলে পড়েচে—এখনও এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী রামটেক্ দেখতে যাব। প্রমোদবাবু তাগাদা দিচ্ছেন। বনশিউলি গাছের সঙ্গে বনতুলসী গাছও আছে—কিন্তু তা পাহাড়ের বাইরের ঢালুতে। একটা সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে! মোটরওয়ালা কোথায় গিয়েচে—হর্ন দিচ্চি—এখনও খোঁজ পাইনি। পাহাড়ের গায়ে ছায়া পড়ে এসেচে। দূরের পাহাড় নীল হতে নীলতর হচ্চে। এখানে হ্রদের সাজানো বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বাংলোয় চৌকিদারের কাছ থেকে জল চেয়ে দুজনেখেলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়-হয়। ড্রাইভারটা কোথায় ছিল—হর্ন দিতে দিতে এল। প্রমোদবাবু ছড়ি ফেলে এসেছেন—হ্রদের ঘাটে নেমে আনতে গেলেন। ফিরে বললেন—ছায়া আরও নিবিড়তর হয়েছে বনের মধ্যে। অপরাহ্ণের ছায়ায় বন আরও সুন্দর দেখাচ্চে।ওখান থেকে মোটর ছেড়ে শৈলমালাবৃত সুন্দর পথে রামটেক্ এলাম। রামটেকে যখনএসেচি, তখন বেলা আর নেই, সূর্য অস্ত গেছে। অপরাহ্ণের ছায়ায় রামটেকের সুবৃহৎ উপত্যকা ও ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যাবৃত শান্ত অধিত্যকাভূমির দৃশ্য আমাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দর মনে হল যে, আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে গেলাম—এইসুন্দর গিরিসানুদেশ এখনি জ্যোৎস্নায় শুভ হয়ে উঠবে, এই নির্জনতা, সেই প্রাচীন দিনের স্মৃতি—এসব মিলে এখনি একে কি অপরূপ রূপই দেবে—কিন্তু আমরাএখানে পৌঁছতে দেরি করে ফেলেচি, বেশিক্ষণ এই ছায়াভরা ধূসর সানুশোভা উপভোগ করতে তো পারব না। পথ খুব চওড়া পাথরে বাঁধানো—কিন্তু উঠেই চলেচি, সিঁড়ি আর শেষ হয় না। প্রথমে একটা দরজা, সেটা এমন ভাবে তৈরী যে দেখলে প্রাচীন আমলের দুর্গদ্বার বলে ভ্রম হয়। তারপর একটা দরজা, তারপর আর একটা—সর্বশেষে মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করে বহিরাঙ্গণের প্রাচীরের ওপরকার একটা চবুতারায় আমরাবসলাম। নীচেই বাঁ ধারে কিন্‌সী হ্রদ, পূর্বে পূর্ণচন্দ্র উঠচে, চারিধারে থৈ থৈ করচে বিরাট space, পশ্চিম আকাশ এখনও একটু রঙীন। মন্দিরে আরতির সময়ে এখানেনহবৎ বাজে, এক ছোকরা বাইরে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসে সানাই বাজাতে শুরু করলে।আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

একটু পরে জ্যোৎস্না আরও ফুটল। আমাদের আর উঠতে ইচ্ছে করে না, প্রমোদবাবুতো শুয়েই পড়েচেন। দূরে পাহাড়ে নীচে আম্বারা গ্রামের পুকুরটাতে জ্যোৎস্না পড়েচিক্‌চিক্ করচে। মন্দির দেখতে গেলাম। খুব ভারী ভারী ভারী গড়নের পাথরের চৌকাঠ, দরজার ফ্রেম—সেকেলে ভারী দরজা, পেতলের পাত দিয়ে মোড়া মোটা গুল্ বসানো। মন্দিরের দুপাশে ছোট ছোট ঘর, পরিচারক ও পূজারীরা বাস করে। তাদের ছেলেমেয়েরাখেলাধুলো করচে, মেয়েরা রান্নাবাড়া করচে। রামসীতার মন্দিরের দরজার পাশেঅনেকগুলি সেকেলে বন্দুক ও তলোয়ার আছে। একজনকে বললুম—এত বন্দুককার? সে বললে—ভোঁস্‌লে সরকারকা। ১৭৮৩ সালে রঘুজী ভোঁস্‌লা এই

বর্তমান মন্দির তৈরী করেন। আম্বারা সরোবরের পাশে ভোঁস্‌লাদের বিশ্রামাবাসের ধ্বংসাবশেষ আছে, আসবার সময় দেখে এসেচি। মন্দিরের পিছনের একটা চবুতারায় দাঁড়িয়ে উঠেনীচে রামটেক্ গ্রামের দৃশ্য দেখলাম—বড় সুন্দর দেখায়! রামটেক্ ঠিক গ্রাম নয়, একটাছোট গোছের টাউন।

মন্দির প্রদক্ষিণের পর পাহাড় ও জঙ্গলের পথে আমরা নেমে এলাম। জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় বনময় সানুদেশ ও পাষাণ বাঁধানো পথটি কি অদ্ভুত হয়েচে। এখানে বসে কোন ভাল বই পড়বার কি চিন্তা করবার উপযুক্ত স্থান। এর চারিধারেই অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যময় গলিঘুঁজি, উচ্চাবচ ভূমি, ছায়াভরা বনান্ত দেশ। আমার পক্ষে তো একেবারেস্বর্গ। ঠিক এই ধরনের স্থানের সন্ধানই আমি মনে মনে করেচি অনেকদিন ধরে।চন্দ্রনাথ পাহাড়ের থেকে এর সৌন্দর্য অনেক বেশি, যদিও চন্দ্রনাথের মত এ পাহাড়অতটা উঁচু নয়। আম্বারা গ্রামটি আমার বড় ভাল লাগল—চারিধারে একেবারে পাহাড়েঘেরা, অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান, গোলা ঘর, একটা সরাইও আছে। ইচ্ছে হলে এখানে এসে থাকাও যায়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নামতে পারলাম না, যদিও প্রতিমুহূর্তে ভয় হচ্চিল, মোটর ড্রাইভার হয়তো কি মনে করবে। বেচারী সারাদিন কিছু খায়নি। আম্বারা গ্রামটা দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি মোটর ছেড়ে সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, কাটা পথটা ঘুরে রামটেক্ টাউনের মধ্যে ঢুকল। পাহাড়ের ঢালুতে বন্য আতাবৃক্ষ অজস্র, এখানে বলে সীতাফল—নাগপুর শহরে যত আতাওয়ালীআতা ফিরি করে—তার সব আতাই ফলে সিউনি ও রামটেক্ পাহাড়ে।

রাত বোধ হয় সাতটা কি সাড়ে সাতটা। মন্দিরের ওপরে চবুতারায় বসে দূরে নাগপুরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখেছিলাম ঠিক সন্ধ্যায়—তাই নিয়ে প্রমোদবাবুরসঙ্গে তর্ক হল, আমি বললুম—ও কাম্‌টির আলো—প্রমোদবাবু বললেন—না, নাগপুরের।

কিন্‌সী হ্রদের বাংলোতে খাবার খেয়েছিলাম, কিন্তু চা খাইনি। রামটেকের মধ্যেঢুকে একটা চায়ের দোকানে আমরা গাড়িতে বসে চা খেলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—রামটেকের পাহাড়ের ওপর সাদা মন্দিরটা জ্যোৎস্নায় বড় চমৎকার দেখাচ্চে—চা খেতেখেতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, এতক্ষণ বারাকপুরেআমার গাঁয়ে বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজচে। লক্ষ্মীপুজোর লুচিভাজার গন্ধ বার হচ্চেবাঁশবনের পথে—এতদূর থেকে সে-সব কথা যেন স্বপ্নের মত লাগে। রামটেকের পথ দিয়ে মোটর ছুটল। কিন্‌সী হ্রদ থেকে মোটরে আসবার সময়ে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, তেমনি আনন্দ পেলাম। সামনে তখন ছিল আঁকা-বাঁকা, উঁচুনীচু পার্বত্য প্রদেশেরকঙ্করময় পথ, ডাইনে ছায়াবৃত অরণ্যেভরা শৈলমালা—এখন ঠিক তেমনি পথ দিয়েমোটর তীরের বেগে ছুটে চলেচে—প্রমোদবাবু বললেন, a glorious drive.

রামটেক্ স্টেশনে নাগপুরের ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুতরাং বোঝা গেল এখনওসাড়ে আটটা বাজেনি। একটু গিয়ে প্রমোদবাবু মাইল স্টোনে পড়লেন—নাগপুর ২৮ মাইল, মান্‌সার ২ মাইল। দেখতে দেখতে ডাইনে মান্‌সারের বিরাট ম্যাঙ্গানিজেরপাহাড় পড়ল—জ্যোৎস্নার আলোতে সুউচ্চ অনাবৃতকায় পাহাড়গুলো যেমনি নির্জন, তেমনি বিশাল ও বিরাট মনে হচ্ছিল। মনে ভাবছিলাম ওই নির্জন শৈলশিখরে, এইঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তাঁবু খাটিয়ে যারা রাত্রিযাপন করে একাএকা তাদের জীবনের অপূর্ব অনুভূতির কথা। আরও ভাবছিলাম এই জ্যোৎস্নায় বহুদূরেরবাংলাদেশের এক ছোট্ট নদীর ধারের গ্রামের একটা দোতলা বাড়ির কথা। ভাবলাম, অনেকদিন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে এখন আরও কাছে কাছে থাকে—যখন খুশিসেখানে যেতে পারে—হয়তো আজ এই জ্যোৎস্নারাত্রে আমার কাছে কাছেই আছে।মান্‌সারে যেখানে নাগপুর-জব্বলপুর রোড থেকে রামটেকের পথটা বেঁকে এল—সেখানে একটা P.W.D. বাংলো আছে, সামনে একটা পদ্মফুলে ভরা জলাশয়। স্থানটি অতি মনোরম। দুপুরে আজ এই ম্যাঙ্গানিজগুলি আমরা দেখে গিয়েছিলাম—বিরাট পর্বতের ওপর মোটর গাড়ি উঠিয়ে নিয়ে গেল—অনাবৃতদেহ পর্বতপঞ্জর রৌদ্রে চকচক করচে, খাড়া কেটে ধাতুপ্রস্তর বার করে দিয়েচে—সামনে schist ও

granite নীচের স্তরগুলোতে কালো ম্যাঙ্গানিজ। একজন ওদেশী কেরানী আমাদের সব দেখালে, সঙ্গেদু টুকরোম্যাঙ্গানিজ দিলে কাগজ-চাপা করবার জন্যে। তারই মুখে শুনলাম এই ম্যাঙ্গানিজ স্তর এখান থেকে ২৫/২৬ মাইল দূরে ভাণ্ডারা পর্যন্ত চলে গিয়েছে—মাঝে মাঝে সমতল জমি, আবার পাহাড় ঠেলে ঠেলে উঠেচে। নাগপুর-জব্বলপুর রোডেঅনেক পাহাড় পড়ে জব্বলপুরে যেতে। সিউনির দিকেও পাহাড় ও জঙ্গল মন্দ নয়।কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য নাগপুর অমরাবতী রোডে। নাগপুর শহর থেকে ২৫ মাইল দূরবর্তী বাজারগাঁও গ্রাম থেকে কানহৌলি ও বোরি নদীর উপত্যকাভূমি ধরে যদি বরাবর সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, তা হলে শৈলমালা, মালভূমি ও অরণ্যে-ঘেরা এক অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে।

মান্‌সার ছেড়ে আমরা নাগপুর-জব্বলপুর রোডে পড়লাম। দুধারে দূরপ্রসারী সমতলভূমি জ্যোৎস্নায় ধু-ধু করচে—আকাশে দু-দশটা নক্ষত্র—দূরে নিকটে বৃক্ষশ্রেণী। এখনও নাগপুর ২৫ মাইল। সারাদিন পাহাড়ে ওঠানামা পরিশ্রমের পরে, হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস বেশ আরামপ্রদ বলে মনে হচ্চে। ক্রমে কামটি এসে পড়লাম। পথে কান্‌হান্‌ নদীর সেতুর উপর এসে মোটরের এঞ্জিন কি বিগড়ে গেল। আমরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীবক্ষের দিকে চেয়ে আর একটা সিগারেট ধরালাম। পেছনে রামটেক্‌ প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা কান্‌হান্‌ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—আমার ইচ্ছে ছিল ট্রেনে মোটরে একটা রেস হয়—কিন্তু তা আর হল না, ট্রেন ছাড়বার আগেই মোটরের এঞ্জিন ঠিক হয়ে গেল। কামটিতে এঞ্জিন আবার বিগড়ালো একবার, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠিক হল। তারপর আমরা নাগপুর এসে পড়লাম—দূর থেকে ইন্দোরের আলো দেখা যাচ্চে।

কিন্তু কিন্‌সী হ্রদের তীরের গিরিসাপুর জঙ্গল আমি এখনও ভুলিনি। শরতের নীল আকাশের তলায় সেই নিবিড় ছায়ানিকেতন অরণ্য প্রদেশটি আমার মনে একটা ছাপ দিয়ে গেছে। আহাঃ! ঐ বনের শিউলি গাছগুলোতে যদি ফুল ফুটত, আরও যদি দু-চার ধরনের বনফুল দেখতে পেতুম—তবে আনন্দ আরো নিবিড় হত—কিন্তু এমনি কত দেখেচি, তার তুলনা নেই। বুনো বাঁশের ছোট ছোট ঝাড়গুলির কি শ্যামল শোভা! পুজোর ছুটি ফুরিয়ে যাবে, আবার কলকাতার লোকারণ্যের মধ্যে ফিরে যাব, আবার দশটা পাঁচটা স্কুলে ছুটব, আবার অপকৃষ্ট 'ক্যালকাটা কেবিন-এ' বসে চা ও ডিমের মামলেট খাব—তখন এই বিশাল পার্বত্যকায় সরোবর, এই শরতের রৌদ্র-ছায়াভরা কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা ঘন অরণ্যানী, এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন গিরিসানু—এই আম্বারা, কিন্‌সী, রামটেকের মন্দির-দুর্গ—এসব বহুকাল আগে দেখা স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে মনের কোণে উঁকি মারবে।

একটা কথা না লিখে পারচিনে। আমি তো যা দেখি, তাই আমার ভাল লাগে—বিশেষ করে যদি সেখানে বন থাকে। কিন্তু তবুও লিখচি আমি এ পর্যন্ত যত পাহাড় ও অরণ্য দেখেচি—চন্দ্রনাথ, ত্রিকূট, কাটনি অঞ্চলের পাহাড়—ডিগরিয়া ও নন্দন পাহাড়ের উল্লেখ করাই এখানে হাস্যকর, তবুও উল্লেখ করচি এইজন্যে যে, এই ডায়েরীতেই কয়েক বছর আগে আমি নন্দন পাহাড়ের সুখ্যাতি করে খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা লিখেচি—এসব পাহাড় কিন্‌সী ও রামটেকের কাছে ম্লান হয়ে যায় সৌন্দর্য ওবিশালতায়।

কাল নাগপুর থেকে চলে যাব। আজ রাত্রে নির্জন বাংলোর বারান্দাতে বসেজ্যোৎস্নাভরা কম্পাউন্ডের দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' পড়চি। সেইপুরনো বইখানা, সিদ্ধেশ্বরবাবুদের আফিসে কাজ করবার সময় টেবিলের ড্রয়ারে যেখানা লুকনো থাকত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চট করে একবার বার করে নিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, দূর দেশের বর্ণনা পড়ে ক্লান্ত ও রুদ্ধশ্বাস চেতনাকে চাঙ্গা করে নিতুম। এখনও মনে পড়চে সেই ছোট টেবিলটা, তার ড্রয়ারটা, ডাইনে কাঠের পার্টিশনটা—সেই রোকড় খতিয়ানের স্তূপ', ফাইলের বোঝা।

কাল বৈকালে একা বেড়াতে বার হয়েছিলাম, কারণ সকালের বম্বে মেলে প্রমোদবাবু হাওড়া ফিরলেন। আমি তাকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হল, তার বাড়ি খড়গপুর, তিনি মতিকাকাকে চেনেন। বললুম, মতিকাকার কাছে আমার নাম বলবেন।

তারপর বৈকালে একা বার হলাম। South Tiger Gap Road দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে একটা মুক্ত জায়গায় সাঁকোর ওপর বসলাম। সামনে ধু-ধু প্রান্তর, দূরে দূরেশৈলশ্রেণী—বাঁয়ে সাতপুরা, ডাইনে রামটেকের পাহাড় ও মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজেরপাহাড় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে। একটু পরে সূর্য ডুবে গেল, পশ্চিম দিগন্তে কত কি রঙফুটল। আমার কেবলই মনে আসতে লাগল ঐ শ্লোকটা—'প্রস্থিতা দূরপন্থানং' ...শ্লোকেরটুকরোটার নতুন মানে এখানে বসেই যেন খুঁজে পেলাম। ভাবলাম আমার উত্তর-পুব কোণে, আরও অনেক পেছনে কাশী ও বিন্ধ্যাচল, মির্জাপুর ও চুনার পড়ে আছে— পশ্চিম ঘেঁষে প্রাচীন অবন্তী জনপদ—পূর্বে প্রাচীন দক্ষিণ কোশল, সামনের ঐ নীল শৈলমালা—যার অস্পষ্ট সীমারেখা গোধূলির শান্ত ছায়ায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—ঐহল মহাভারতের কিংবা নৈষধ চরিতের সেই ঋক্ষবান পর্বত। এই যেখানে বসে আছি,এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অমরাবতীর কাছে পদ্মপুর বলে গ্রামে কবিভবভূতির জন্মস্থান। এ সব প্রাচীন দিনের স্মৃতিজড়ানো প্রান্তর, অরণ্য, শৈলমালা, দিগন্তহীন মালভূমির গম্ভীর মহিমা, এই রকম সন্ধ্যায় নির্জনে বসলেই মনকে একেবারেঅভিভূত করে দেয়।

পূর্বে চেয়ে দেখি হঠাৎ কখন পূর্ণচন্দ্র উঠে গেছে। তারপর জ্যোৎস্না-শোভিত Tiger Gap Road-এর বনের ধার দিয়ে শহরে ফিরে এলাম। শরতের রাত্রের হাওয়া বন্যশিউলির সুবাসে ভারাক্রান্ত ও মধুর। Lawrence Road-এর মোড়ে এসে পথ হারিয়েফেলেছিলাম—তিনজন বাঙালী ছোকরার সঙ্গে দেখা—তারা আমায় বাংলোর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি ওখান থেকে চলে গেলাম সীতাবল্‌ডির বাজারে ঘড়ির দোকানে। সেখানেরেডিওতে কলকাতা Short Wave ধরেচে, বাংলা গান বাজচে—একটু পরে রেডিওস্টেশনের বিষ্ণু শর্মা সুপরিচিত গলায় কি একটা গানের ঘোষণা করলে। মনে মনে ভেবে দেখলাম কত পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে ৭৫০ মাইলের ব্যবধান ঘুচিয়ে বিষ্ণু শর্মার গলা এখানে এসে পৌঁছলো—যে মুহূর্তে সে গাস্টিন প্লেসের সেই রাঙা বনাত মোড়া ঘরটায় বসে একথা বললে সেই মুহূর্তেই! রেডিওর অদ্ভুতত্ব এভাবে কখনো অনুভবকরিনি—কলকাতায় বসে শুনলে এর গভীর বিস্ময়ের দিকটা বড় একটা মনে আসেনা।

তারপর টাঙা নিয়ে নেরুলকরের ওখানে গেলাম। ডাক্তার বেরিয়ে গিয়েচে—বসেবসে "The Story of the Mount Everest বইখানা পড়লাম—রাত দশটা বাজে, এখনও ডাক্তার এল না। আমি একটা চিঠিতে লিখে এলাম, কাল সকালে দুবেকে সঙ্গেনিয়ে যেন নেরুলকর আমাদের ওখানে আসে। তারপর একটা টাঙা নিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিতস্টেশন দিয়ে ফিরলাম।

সকালে সীতাবল্‌ডির ঘড়ির দোকানে ঘড়ি সারাতে গেলাম—ওখান থেকে গেলামডাঃ নেরুলকরের ওখানে ও স্টেশনে বার্থ রিজার্ভ করতে। দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়েগোঁড় জাতির অস্ত্রশস্ত্র,বালাঘাট পার্বত্যদেশের খনিজ প্রস্তর, fossil, জব্বলপুরেরঅধুনালুপ্ত অতিকায় হস্তী, নর্মদার উত্তরে অরণ্যের অধুনালুপ্ত সিংহ, বনবিড়াল, ঝিন্দ্‌ওয়ারাজঙ্গলের বাইসন বা সৌর—কত কি দেখলাম। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের চেদীরানীলোহলের প্রস্তরলিপি ও বৌদ্ধ রাজা সূর্য ঘোষের পুত্র রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে পড়েযাওয়ার ফলে মারা যাওয়াতে ভগবান তথাগতের উদ্দেশে পুত্রের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তিনি যে মন্দির নির্মাণ করেন—সে লিপিটিও পড়লাম। আজ খুব রোদ, আকাশ খুব নীল, বাংলোর বারান্দায় বসে লিখচি। এখনি চা খেতে যাব।

তারপর আমরা রওনা হলুম। ডাঃ নেরুলকর স্টেশনে এসে আমাদের সঙ্গে দেখাকরে গেলেন। ড্রুগ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যবর্তী বিখ্যাত সালাকেসা ফরেস্ট দেখব বলে আমরা রাত দেড়টা পর্যন্ত জেগে বসে রইলাম। নাগপুর ছাড়িয়ে ছোট ছোট শালের জঙ্গল অনেক দেখা গেল—জ্যোৎস্না রাত্রে প্রকাণ্ড অরণ্যটার রূপ আমার মনে এমনএক গম্ভীর অনুভূতি জাগালে—সে রাত্রে ঘুম আমার আর এল না—ডোঙ্গরগড়স্টেশনে গাড়ি এসে পড়ল, রাত তিনটে বেজে গেল, ঘুমুবার ইচ্ছেও হল না—জানালাথেকে চোখ সরিয়ে নিতে মন আর সরে না।

নাগপুর থেকে ফিরেই দেশে গিয়েছিলাম। ইচ্ছামতী দিয়ে নৌকোতে বিকেলের দিকে গ্রামের ঘাটে পৌঁছুলাম—বাল্যে একটা কি ছেলেদের কাগজে একটা কবিতাপড়েছিলাম—

'ঘাটের বাটে লাগল যবে আমার ছোট তরী,

ঘনিয়ে আসে ধরায় তখন শীতের বিভাবরী।'

এতকাল পরে সেই দুটি চরণই বার বার মনে আসতে লাগল। মাধবপুরের মাঠে সূর্য অস্ত গেল, চালতেপোতার বাঁকের সবুজ ঝোপঝাপ দেখলাম—এবার কিন্তু চোখে লাগল না তেমন। কেন এমন হল কি জানি?

অবশ্য একথা ঠিক, এমন ঘন সবুজ ও নিবিড় বনসম্পদ C. P. অঞ্চলের নেই—সে হিসেবে বাংলাদেশের তুলনা হয় না ওসব দেশের সঙ্গে; কিন্তু ভূমিসংস্থান বিষয়ে বাংলা অতি দীন। জলকাদা, ডোবা, জলা, ugly জঙ্গল,—এ বড় বেশি। লোকেও ভূমিশ্রী বর্ধিত করতে জানে না, নষ্ট করতে পারে। নানা কারণে বর্ষাকালে বাংলাদেশআদৌ ভাল লাগে না। আবার খুব ঘন বর্ষায় খুব ভাল লাগে—যেমন শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিনগুলিতে, যখন জলে থৈ-থৈ করে চারিধার। শেষ শরতের এসব বর্ষার সৌন্দর্য নেই, কিন্তু অসুবিধে ও শ্রীহীনতা যথেষ্ট। গাছপালায় মনকে বড়চাপা দিয়ে রাখে।

এবার কলকাতায় বড় ভাল লাগচে।

কাল সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েচি সারাদিন। সকালে বিশ্বনাথের মোটরেগোপালনগর গিয়েছিলাম— তারপর লাঙ্গলচষার প্রতিযোগিতা হল, ছেলেদের দৌড় হল—তারপর বিকেলে বেলেডাঙ্গা গেলাম। সেখানে একটা ডাব খাওয়া গেল—স্কুলে যুগল শিক্ষক এল।

দেশ, খয়রামারির মাঠ এত ভাল লাগচে এবার! কাল হারাণ চাকলাদার মহাশয়ের ছেলের কৃষিক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম—মাঠের মধ্যে ফুলের চাষ করেচে—বেশ দেখাচ্ছে। একটা ষাঁড়া গাছের কুঞ্জবন বড় সুন্দর। এবার জ্যোৎস্না খুব চমৎকার, শীতও বেশ। রোজ খয়রামারির মাঠে বেড়াই। আজ একা যাবো। একলা না গেলে কিছু হয় না।

রাজনগরের বটতলায় রোজ বেড়াতে যাই। সামনে অপরূপ রঙে সূর্য অস্ত যায় দিগন্তের ওপারে, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ চারিদিক—মাটির সুঘ্রাণ স্মরণ করিয়ে দেয়ইসমাইলপুরের জনহীন চড়ায় এমন সব শীতের সন্ধ্যা, কত সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, কতকৃষ্ণা নিশীথিনীর শেষ যামের ভাঙা চাঁদের জনমানবহীন বনের পেছনে অস্ত যাওয়া, কত নীল পাহাড় ঘেরা দিকচক্রবাল, বিষম শীতের রাত্রে গনোরী তেওয়ারীর মুখেঅদ্ভুত গল্প শোনা অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বসে বসে।

সে সব দিন আজকাল কতদূরের হয়ে গেছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটাতে সকালে নীরদবাবুদের সঙ্গে বহুকাল পরে বেলুড়গিয়েছিলাম। পেছনের ছাদটাতে বসে আবার পুরনো দিনের মত কত গল্প করলাম। পেছনের ছাদটা, বেলুড়ের বাড়ির চারিপাশের বাগান এত ভাল লাগল। ভেবেছিলামএখানেআর আসা হবে না। সেই বেলুড়ে আবার যখন আসা হল,—বিশেষ করে সেইশীতকালেই, যে শীতকালের রাত্রির সঙ্গে বেলুড়ে যাপিত কত রাত্রির মধুর স্মৃতির যোগরয়েচে—তখন জীবনের অসীম সম্ভাব্যতার উপলব্ধি করে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সবাই মিলে আমরা চড়ুইভাতি করে খেলাম নীচের রান্নাঘরটাতে। পেঁপের ডাল হাতেরোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসলাম মালীর ঘরের সামনে, নীচের ছাদটায় ফলসা গাছের ডালেসেই অপূর্ব অবনমন দেখলাম, যা ওই ফলসা গাছটারই নিজস্ব, অন্য গাছের এসৌন্দর্যভঙ্গি দেখিনি কখনো—বাগানের পাঁচিলের ওদিকে পাটের কলে নিবারণ মিস্ত্রীরসেই গোলপাতার ঘরখানা, শীতের দিকে গাঁদাফুল-ফোটা নিকানো দুপাশে তক্‌তকে

উঠোন—সব যেন পুরাতন, পরিচিত বন্ধুর মতো আমাদের প্রাণে তাদের স্নেহস্পর্শপাঠিয়ে দিলে, বড় ভাল লাগল আজ বেলুড়।

সন্ধ্যার আগেই মোটরে চলে এলাম কলকাতায়। কাল গিয়েছে পূর্ণিমা, আজ প্রতিপদের চাঁদ রাত সাড়ে সাতটার পরে উঠল। ধোঁয়া নেই, এই যা সৌভাগ্য।

অনেকদিন পরে আজ আমড়াতলার গলির মুখে গিয়ে পড়েছিলাম—এতদিন চিনিনি—আজ চিনেচি।

এবার ইস্টারের ছুটিটা কাটাতে এলুম এখানে। সেবার এসে নীল ঝরনার যেউপত্যকা দেখে গিয়েছিলাম—আবার জ্যোৎস্না রাত্রে নিমফুল ও শালমঞ্জরীর ঘনসুবাসের মধ্যে সে সব স্থান দেখলাম। রানীঝরনার পথে পাহাড়ে উঠে গোঁড় জাতিরগ্রামে আবার বেড়িয়ে এলাম। আজ বেড়িয়ে এলাম সকালে কাঁকড়াগাছি ঘাট। সারাপথের দুধারে বন, তবে এখন শাল ও মহুয়া গাছ প্রায় নিষ্পত্র—তলায় সাদা সাদা মহুয়া ফুলটুপটাপ ঝরে পড়চে। রাখামাইনস ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে বন বেশ ঘন, বড় বড় ছায়াতরুও আছে। কাঁকড়াগাছি ঘাটটা বড় চমৎকার,—এখানে একটা জায়গার চারিধারেই পাহাড়ের শ্রেণী। ছোট একটা ঝরনা আছে—তবে এখন ঝরনাতে জল খুবই কম। ওদিকে বনগাছের শোভা এদিকের চেয়ে সুন্দর। অপরাহ্ণে বা জ্যোৎস্নারাত্রে যেএসব স্থানের শোভা অপূর্ব হবে সেটা বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। নীরদবাবুরা গরুর গাড়িতে এলেন—আমি দেখলাম ওর চেয়ে হেঁটে আসা অনেক বেশি আরামের। বাংলোর সামনে ছোট বাঁধটাতে স্নান করে এলাম। জল বেশ ভাল। খুব সম্ভব আজই রাত্রে কলকাতাতে ফিরব।

কাল রাখামাইন্‌স্‌ থেকে বৈকালে হেঁটে আমরা তিনজন চলে এলাম শালবনেরমধ্যে দিয়ে অস্তসূর্যের আলোয় রাঙানো সুবর্ণরেখা পার হয়ে। আজ সকালে গালুডিরবাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। কাল রাতের চাঁদটা যে কখন কালাঝোরপাহাড় শ্রেণীর পিছন দিয়ে উঠল তা মোটেই টের পাইনি—স্টেশন থেকে এসে দেখিচাঁদ উঠে গিয়েচে। কিন্তু অনেক রাত্রে স্টেশনের পথের ছোট ডুংরিটার সাদা সাদা কোয়ার্টজ পাথরের চাঁইগুলো, ছোট বটগাছটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আজ সকালে গুইরামগাড়োয়ানের সঙ্গে দেখা, সে বললে ঠিকরী ও ধারাগিরির পথের জঙ্গলে খুব বন, বাঘের ভয়ও আছে। এবার আর যাওয়া হল না, পূজার সময় যাব।

এবার জীবনটা খুব গতিশীল হয়ে উঠেচে। এই তো গত শনিবারের রামনবমী দোলের দিনও বারাকপুরে ছিলাম। দেখলাম আমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশ বনে কিরকমশুকনো পাতার রাশ পড়েচে, নদীর ধারে চটকাতলা খালের উঁচু পাড়ে কিরকম ঘেঁটুফুল ফুটেছে, রঘুদাসীদের বাড়িতে ওরা আবার এসেচে, পথে রঘুদাসীর সঙ্গে দেখা। তারপরেখয়রামারির মাঠে সেই বেদেদের তাঁবুর ছোট গর্তটা, সেখানে সেদিনও আকন্দ ফুলের শোভা দেখতে গিয়েচি—রাজনগরের বটতলাটা সন্ধ্যাবেলায় একা বেড়িয়ে এসেচি আরভেবেচি এসব জায়গা কত নিরাপদ, কত নিরীহ—হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে গালুডিরবাগানের পিছনে বসে লিখছি—রানীঝরনা নেকড়েডুংরি সব দেখা হয়েই গেছে। রাখামাইন্‌সে দুরাত্রি যাপন করে এলাম।

কিন্তু একটা দেখলাম ব্যাপার। এসব স্থানে সঙ্গী নিয়ে আসতে নেই। একা থাকলেনিজের মন নিয়ে থাকা যায়। তখন নানা অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত ভাব এসে মনে জোটে। কিন্তু সঙ্গীরা থাকলে তাদের মন আমাকে চালিত করে—আমার মন তখন আর সাড়াদেয় না, কেমন গভীর অতল তলে লাজুক তার মুখ লুকিয়ে থাকে। কাজেই সঙ্গীদেরচিন্তা তখন হয় আমার চিন্তা—সঙ্গীদের ভাব তখন হয় আমার ভাব, আমার নিজস্বজিনিস সেখানে কিছু থাকে না। কাল সুবর্ণরেখার পারের সূর্যাস্তের দৃশ্যটা কিংবা গভীররাত্রের জ্যোৎস্নায় মহুলিয়ার প্রান্তরের ও নেকড়েডুংরি পাহাড়ের সে অবাস্তব সৌন্দর্য, একা থাকলে এসব দৃশ্যে আমার মন কত অদ্ভুত কথা বলত—কিন্তু কাল শুধু আড্ডা দেওয়াই এবং চা খাওয়াই হল—মন চাপা পড়ে রইল বটে, অর্থহীন প্রলাপ বকুনিরতলায়, সম্মিলিত সিগারেটধূমের কুয়াশার আড়ালে।

তাই বলচি এসব স্থানে আসতে হয় একা। লোক নিয়ে আসতে নেই।

আজই এখান থেকে যাব। এখনি বলরাম সায়েরের ঘাটে নেয়ে আসবো—অনেকদিনপরে ওতে বড় আনন্দ পাব। দূরে কালাঝোর পাহাড়, চারিধারে তালের সারি, স্বচ্ছশীতল জল—দীঘিটা আমার এত ভাল লাগে!

শালবনে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকচে কালাঝোর পাহাড়ের দিকে। এত ভাল লাগচে সকালটা!

খুড়োদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মবকাশে বাড়ি এসেচি। এবার গালুডিতে অনেকদিনথেকে আমার যেন নতুন চোখ খুলেচে, গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য এবার বেশি করেচোখে পড়েচে। সমস্ত প্রাণটা যেন একটা পার্ক—আমার বাড়িতে কোন গাছ থাকুকআর নাই থাকুক, সারা গ্রাম এমন কি কুঠির মাঠ, ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল বাঁশবন—এসবই আমার। আমি দেখি, আমার ভাল লাগে—আমার না তো কার?

প্রায়ই বিকেলে কুঠির মাঠে বেড়াতে যাই, এবার একটা নতুন পথ খুলেচে মাঠেরমধ্যে দিয়ে, সেটা আরও অপূর্ব। এমন সবুজ মাঠে, উলুফুল ফুটেচে চারিধারে, শিমুলগাছহাত বেঁকিয়ে আছে, দূর বনান্তশীর্ষে বিরাটকায় Lyre পাখির পুচ্ছের মতো বাঁশবনেরমাথা দুলচে, এমন শ্যামলতা, এমন শ্রী—এ আমাদের এই দেশটা ছাড়া আর কোথাওনেই। দুপুরে আজ বেজায় গরম, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলে অত গরমেও খুবঘুমুলাম।

উঠে দেখি মেঘ করেচে। উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন নীল-কৃষ্ণ কালবৈশাখীর মেঘ,—তারপর উঠল বেজায় ঝড়। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না, একখানা গামছানিয়ে তখনি নদীর ঘাটে চলে গেলাম। পথে জেলি বললে শিগ্‌গির নেকো তলায় যান, ভয়ানক আম পড়চে। কিন্তু আজ আর আম কুড়োবার দিকে আমার খেয়াল নেই। আমিনদীর ধারে কালবৈশাখীর লীলা দেখতে চাই। নদীজলে নামবার আগেই বৃষ্টি এল। বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল—জলে নেমে দেখি জল গরম, যেন ফুটচে। এপার ওপার সাঁতার দিতে লাগলাম, কালো জলে ঢেউ উঠেচে, মুখে নাকে মাথায় ঢেউ ভেঙেপড়চে, ওপারে চরের ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, বন্যেবুড়ো গাছ ঝড়ে উল্টে উল্টে যাচ্চে, বৃষ্টির ধোঁয়ায় চারিধার অন্ধকার হয়ে গেল, নদীজলের অপূর্ব সুঘ্রাণ বেরুচ্চে, দূর দূরসমুদ্রের কথা মনে হচ্চে। এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা—প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত ধরাধরি করে চলা—ঐ শ্যামল ডালপালা ওঠাশিমুলগাছ, সাঁইবাবলা গাছ—এই তো আমি চাই। এদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করব—ঐ ঝোড়ো-মেঘে আমার ভগবানের উপাসনা, ঐ তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুতে, এই কালোনদীজলের ঢেউয়ে, ঝড়ের গন্ধে, বাতাসের গন্ধে, বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধে,চরেরঘাসের কাঁচা গন্ধে—।

কাল কুঠির মাঠে বসে এই সব কথা ভাবছিলাম। তারপর নদীজলে নাইতে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব মনে এল। সমস্ত দেহ মন যেন আপনা-আপনি নুয়ে পড়তেচাইল। এ ধরনের ভক্তি একটা বড় bliss, জীবনে হঠাৎ আসে না। যখন আসে, তখনবিরাট রূপেই আসে। আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে প্রাণের তীরে। এ Realisation যেমনদুর্লভ, তেমনি অপূর্ব।

আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তাঁর এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।

এবার মোটে বৃষ্টি নেই—পথঘাট এখনও শুকনো খটখটে, অন্যবার এমন সময় খানা ডোবা জলে ভরে যায়, কুঠির মাঠের রাস্তায় কাদা হয়। তবে এবার সোঁদালি ফুলযেন কমে আসচে, বেল ফুলের গন্ধেরও তেমন জোর নেই।

কাল বিকেলে পাঁচি এসেছে। সে, আমি, খুকু, রাণু মায় ন'দি ক'জনে কাল বসেকালিদাসের মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের চর্চা করেচি। বিকেলে আমি কুঠির মাঠে বেড়াতেগেলাম। ঘাটে স্নান করতে এসে দেখি ওরা সবাই

ঘাটে—খুকু ও রাণু সাঁতার দিয়েগিয়েচে প্রায় বাঁধালের কাছে। আমি স্নান সেরে উঠে আসচি, কালো তখন গেলশিমুলতলাটার কাছে। আমি বললুম, তোর মা ঘাটে তোকে যেতে ডাকচে। সে 'যাই'বলে একটা বিকট চীৎকার করে চলে গেল। একটু পরে দেখি খুকু আমায় ডাকচে—বাঁশবন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেচে—ও ঘাট থেকে আসবার সময় বোধ হয় অন্ধকার দেখে ভয় পেয়েচে। আমি দাঁড়িয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।

আজ ওবেলা স্নানের সময়ে মনে কি যে এক অপূর্ব ভাব এসেছিল! প্রতিদিনেরজীবন এই মুক্তরূপা প্রকৃতির মধ্যে সার্থক হয় এখানে—এইসব ভাবে ও চিন্তায়ঐশ্বর্যে।

আজ অনেক কাল পরে ন'দির কাছ থেকে গৌরীর হাতের লেখা একখানা গানের খাতা পেয়েচি। এতদিন কোথায় এখানা পড়ে ছিল, বা কি করে ন'দির হাতে এল— তার কোন খবর এরা দিতে পারলে না। Appropriately enough. খাতায় প্রথমগানটিই হচ্চে—

ঐ নীল উজ্জ্বল তারাটি

করুণ, অরুণ তরুণ কিরণ অমিয় মাখান হাসিটি

বহুদূর জগতে গিয়েছে গো চলি প্রণয়বৃন্ত ছিঁড়িয়া

ভালবাসা সব ভুলে গেছে...

চৌদ্দ পনেরো বছর আগের এমনিধারা কত উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত প্রভাত, বর্ষায়কত মেঘমেদুর সন্ধ্যার কথা মনে আনে।...

যাক। কাল আকাশে হঠাৎ বৃশ্চিক নক্ষত্র দেখেচি—একে প্রথম চিনি বেলপাহাড়ের স্টেশনে—পরিমল আমাকে চিনিয়ে দেয়—আমি ওটা চিনতাম না। কাল দেখিশ্যামাচরণদাদাদের বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর বিরাট ওর অগ্নিপুচ্ছটা বেঁকে আছে। আকাশেরওদিকটা আলো হয়ে উঠেচে...খুকুকে বললুম, ঐ দ্যাখ বৃশ্চিক নক্ষত্র—

তাকে চিনিয়ে দিলুম। রাণু জিগ্যেস করলে—তবে তার বয়েস যদিওখুকুর চেয়ে অনেক বেশি, সে অত বুদ্ধিমতী নয়—পনেরো মিনিট কঠিন পরিশ্রমের পরে তাকেবোঝাতে পারলুম কোন্‌টাকে আমি বৃশ্চিক রাশি বলতে চাচ্চি।

এদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ঢলে পড়চে ক্রমেই মেজো খুড়ীমাদের রান্নাঘরের ওপরে। রাত অনেক হল, ওরা তবুও তাস খেলবেই। বেগতিক দেখে বললুম, আলোতে তেলনেই।

নইলে ঘুম হবার যো নেই, ওদের খেলার গোলমালে।

লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম, রাত তখন বারোটার কম নয়।

বিকেলে কালো আর আমি মোল্লাহাটির পথে বেড়াতে গেলাম। আজ দুপুরে যখনএপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাই, তখনই খুব মেঘ করেছিল—একটু পরে সেই যে বৃষ্টি এল, আর রোদ ওঠেনি। মেঘ ভরা বিকেলে শ্যামল মাঠও দূরের বাঁশ বন, বড় বড় বটগাছ, এক রকম কি গাছ আছে, মখমলের মত নরম সবুজ পাতা ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে ঝোপের সৃষ্টি করে—এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মোল্লাহাটি ও পাঁচপোতা বামুনডাঙ্গার পথের মোড়ে গিয়ে একখানা ছই-চাপা গরুর গাড়ির সঙ্গে দেখা হল। তাদের গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে, বাবুর কাছে কি বিড়িআছে?

—না, নেই। বিড়ি খাইনে—

—আপনারা কোথায় যাবেন?

—কোথাও যাব না, এই পথে একটু বেড়াচ্চি।

ফিরবার পথে মনে হল কলকাতায় থাকবার সময় যখন গাছপালার জন্যে মনটাহাঁপায়, তখন যে কোনো একটু ছবি, একটা বনের ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয়, ওঃ কিবনই এদেশে! প্রায়ই বিদেশের ফটো—আফ্রিকার, কি দক্ষিণ আমেরিকার—কিন্তু তখন ভুলে যাই যে আমাদের গ্রামের চারিপাশে সত্যিকার বন জঙ্গল আছে অতি অপূর্ব ধরনের—যখন বিলিতি Grand Evening Annual দেখি তখন ভুলে যাই কত ধরনেরঅদ্ভুত গাছ আছে আমাদের বনে জঙ্গলে—যা বাগানে, পার্কে নিয়ে রোপণ করলে অতি সুদৃশ্য কুঞ্জবন সৃষ্টি করে—যেমন ষাঁড়া, কুঁচলতা, ঐ নাম-না-জানা গাছটা—এরা যে-কোন বিখ্যাত পার্কের সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে।

সেদিন যখন আমি, রাণু, খুড়ীমা, ন'দি নদীতে বিকেলে স্নান করচি তখন একটা অদ্ভুত ধরনের সিঁদুরে মেঘ করলে—ওপারের খড়ের মাঠের উলুবনের মাথা, শিমুলগাছের ডগা, যেন অবাস্তব, অদ্ভুত দেখাল, যেন মনে হচ্ছিল ওখান থেকেই নীল আকাশটার শুরু।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় একা নদীতে নেমে যে অপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল তা বোধ হয় জীবনে আর কোনদিন হয়নি। তার মাথায় একটা তারা উঠেচে—দূরে কোথায় একটাডাহুক পাখি অবিশ্রান্ত ডাকচে। মাধবপুরের চরের দিকে ভায়োলেট রঙের মেঘ করেচে—শান্ত, স্তব্ধ নদীজলে তার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব।

মানুষ চায় এই প্রকৃতির পটভূমির সন্ধান। এতদিন যেন আমার Emerson-এরমতের সঙ্গে খুব মিল ছিল—সেদিনও বঙ্গশ্রী আপিসে কত তর্ক করেচি, আজ একটু মনে সন্দেহ জেগেচে। মানুষ এই সৃষ্টিকে মধুরতর করেচে। ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম যদি না থাকে, তবে ওর সার্থকতা কিছুই নয়। হৃদয়ের ধর্ম সবধর্মের চেয়ে বড়।

আজ সকাল থেকে বর্ষা নেমেচে। ঝিম্-ঝিম্ বাদলা, আকাশ অন্ধকার। আজ এই মেঘমেদুর সকালে একবার নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করচে—বাঁওড়ের ধারেরবেলে মাটির পথ বেয়ে একেবারে কুঁদীপুরের বাঁওড় বাঁয়ে রেখে মোল্লাহাটির খেয়া পারহয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্চে পিসিমার বাড়ি পাট্‌শিমলে বাগান-গাঁ। কাল সুন্দরপুর পর্যন্তবেড়াতে গিয়েছিলুম বৈকালে—ও পথের প্রাচীন বটগাছের সারির দৃশ্য আমি আবাল্যদেখে আসচি, কিন্তু ও পুরনো হল না—যত দেখি ততই নতুন। গাছে গাছে খেজুরপেকেচে, কেঁয়োঝাঁকা গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা গজিয়েচে এই বর্ষায়। আরামডাঙ্গারমাঠে মরাগাঙের ওপারে, সবুজ আউশ ধানের ক্ষেত এবং গ্রামসীমায় বাঁশবনের সারি মেঘমেদুর আকাশের পটভূমিতে দেখতে হয়েচে যেন কোন বড় শিল্পীর হাতে-আঁকাল্যান্ডস্কেপ। ক্ষেত্রকলু ওদিক থেকে ফিরচে, হাতে ভাঙা লণ্ঠন একটা। বললে মোল্লাহাটিরহাটে পটল কিনতে গিয়েছিল।

—পটল না কিনেই ফিরলে যে?

—কি করব বাবু, ছ'পয়সা সের দর। একটা পয়সাও লাভ থাকচে না। গোপালনগরের হাটেও ওই দর। এবার তাতে আবার পটল জন্মায়নি। যে দুব্বচ্ছর পড়েচে বাবু।

কলকাতাটা যেন ভুলে গিয়েচি। যেন চিরকাল এই বটের সারি, বাঁওড়, সুন্দরপুর, সখীচরণের মুদীখানার দোকানে কাটাচ্চি জীবনটা। এদের শান্ত সঙ্গ আমার জীবনেআনন্দ এনেচে উগ্র দুরাশার মত্ততা ঘুচিয়ে। সে দুরাশাটা কি? নাই বা লিখলাম সেটা।

আজ বিকেলে সারা ঈশান কোণ জুড়ে কালবৈশাখীর মেঘ করল এবং ভয়ানক ঝড়উঠল। হাজারী জেলেনী, জগবন্ধু, কালো, জেলি ওরা আমকুড়ুতে গেল বাগানে—কারণ এখনও আম যথেষ্ট আছে, ঝিনুকে গাছে, চারা বাগানে, মাঠের চারায়।

তারপর ঘন বর্ষা নামলো—আমি আর কালো বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লামবর্ষাস্নাত গাছপালা, বটের সারি, উলুর মাঠের মধ্য দিয়ে বেলেডাঙ্গাতে। সেখান থেকেযখন ফিরি, বর্ষা আরও বেশি, বিদ্যুতের এক একটা শিখা দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী—আকাশে কালো কালো মেঘ উড়ে চলেচে—আমার মনে হল আমিও যেন ওদের সঙ্গেচলেছি মহাব্যোম পার হয়ে চিন্তাতীত কোন্ সুদূর বিশ্বে—আকাশ মহাকাশে আমার সেগতি—পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন, সুখদুঃখ ঘরগৃহস্থালীর বন্ধনমুক্ত আমার আত্মা, সে পায়েরতলায় সারা পৃথিবীর মোহ মাড়িয়ে চলেচে—মহাব্যোমের অন্ধকার, শূন্য মেঘ, ইথার, সমুদ্র ভেদ করে মুক্তপক্ষ গতিতে অমিত তেজে চলেচে—দিক্পাল বৈশ্রবণের বিশ্ববিদ্রাবণকারী পৌরুষের বীর্যে।

নদীতে স্নান করতে নেমে সাঁতার দিয়ে বৃষ্টি মাথায় চলে গেলুম ওপারে মাধবপুরের চরের ওপর বর্ষা দেখতে—পশ্চিম দিকে পিঙ্গল বর্ণের মেঘ হয়েচে, ওপারের বাঁশবন হাওয়ায় দুলচে—তারপর আমরা আবার এপারে এলাম—ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি এলাম।

আজকার সন্ধ্যাটি ঠিক বর্ষাসন্ধ্যা—কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্চে। যেন আরকেউ থাকলে ভাল হত—কত থাকলেই তো ভাল হত—সব সময় হয় কৈ?

আমার মনে এই যে অনুভূতি—এ অনেক কাল পরে আবার হল। আমি কতনিঃসঙ্গ নির্জন জীবন যাপন করেচি কতকাল ধরে, লোকালয় থেকে কতদূরে। কিন্তু১৯২৩-২৬ সালের পরে ঠিক এ ধরনের বেদনা-মাখানো নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আরকখনো হয়নি। এই মনের অবস্থা আমি জানি, চিনি একে—এ আমার পুরাতন ওপরিচিত মনোভাব, কিন্তু ১৯২৬ সালের পরে ভুলে গিয়েছিলাম একে—আবার সেই ফিরে এল।

কাল আবার খুব আনন্দ পেয়েচি। মনের ও ভাবটা কাল আর ছিল না। বিকেলে আমরা কাঁচিকাটার পুলের পথে অনেকদূর পর্যন্ত বেড়াতে গেলাম। নীল মেঘে সারাআকাশ জুড়ে ছিল—কাল স্নান করে ফিরবার পথে শিমুল গাছটার ওদিকে আউশ ধানের ক্ষেতের ওপরকার নীল আকাশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—অমনি মনের ভাব বিকেলেও হয়েছিল। আরামডাঙ্গার ওপারে সেই খাবরাপোতার দিকেরআকাশে একটা নীল পিঙ্গল বর্ণ-শ্রী, সূর্য বোধহয় অস্ত যাচ্ছিল, আমরা কিন্তু পেয়ারাগাছটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না—আমি আর কালো কত খুঁজলাম, আরামডাঙ্গার পথে মরাগাঙের ধারে সেই পেয়ারা গাছটা যে কোথায় গেল!

সন্ধ্যার কিছু আগে কুঠির মাঠে একটা ঝোপেঘেরা নতুন জায়গা আবিষ্কার করা গেল—এদিকটায় কখনো আসিনি—এমন নিভৃত স্থানটা, খুব আনন্দে নদীতে সাঁতারদিলাম।

এবার বারাকপুরে চমৎকার ছুটিটা কাটল। সমস্ত ছুটিটাই তো এখানে রয়েচি। আর বছর এখানে ১০/১১ দিন মাত্র ছিলাম—বনগাঁয়ে ছিলাম বেশিদিন। এবার এখানথেকে কোথাও যাইনি। এখান থেকে যেতে মনও নেই। কলকাতার জীবনটা যেন ভুলেযেতে বসেচি।

কাল বিকেলে ঘন কালো মেঘ করে বৃষ্টি এল। আমি আর কালো বৃষ্টিমাথায় বেলেডাঙ্গার পুল পর্যন্ত বেড়াতে গেলাম। ঝোপঝাপ ভিজে কেমন হয়ে গিয়েচে—গাছপালার গুঁড়ির রং কালো—ডালপাতা থেকে জল ঝরে পড়ার শব্দ। তারপর নদীর জলে স্নান করতে নামলাম—সাঁতার দিয়ে বাঁধাল পর্যন্ত গেলাম।

সাঁতার দিয়ে এত আনন্দ পাইনি কোনদিনএবারকার গরমের ছুটির আগে। কুঠিরমাঠের একটা নিভৃত স্থানে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—মাথার ওপর কালোমেঘ উড়ে যাচ্চে—দিক থেকে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের শিখা—শুধু চারিদিকে বৃষ্টিরশব্দ,—গাছে পাতায়, ডালপালায় ঝোড়ো হাওয়া বইচে—নির্জন প্রান্তরের মধ্যে একাদাঁড়িয়ে থাকার সে অনুভূতির তুলনা হয় না। তার প্রকাশের ভাষাও নেই—যা খুবঘনিষ্ঠ, খুব আপন, তাকে কি আর প্রকাশ করা যায়?

আজ বিকেলে বহুদিন পরে ভারী সুন্দর রাঙা রোদ উঠল। বাঁধালের কাছে নাইতেনেমে মাঝ জলে গিয়ে ওপারের একটা সাঁইবাবলা গাছের ওপর রোদের খেলাদেখছিলাম—কি অদ্ভুত ধরনের ইন্দ্রনীল রং-এর আকাশ, আর কি অপূর্ব সোনার রংরোদের।...সকলের চেয়ে সেই সাঁইবাবলা গাছের বাঁকা ডালপালা ও ক্ষুদে ক্ষুদে সবুজপাতার ওপর সোনার রংয়ের রোদের খেলা।...তারই পাশে ওপারের কদম্ব গাছটাতে বড়বড় কুঁড়ি দেখা দিয়েচে...শ্রাবণের প্রথমেই ফুল্লপুষ্পসম্ভারে নতশাখ-নীপতরুটি বর্ষাদিনেরপ্রতীক স্বরূপ ওই সবুজ উলুখড়ের মাঠে স্বমহিমায় বিরাজ করবে—বর্ষার ঢল নেমেইছামতী বেড়ে ওর মূল পর্যন্ত উঠবে, ঝরা কেশরাজি ঘোলাজলের খরস্রোতে ভেসে চলে যাবে...উলুবন আরও বাড়বে...আমি তখন থাকবো কলকাতায়, সে দৃশ্য দেখতেআসবো না।

কাল সকালে এখান থেকে যাবো, আজই এখানে থাকার শেষ দিন এ বছরের মতো। এবার ছুটিটা কাটল বেশ—কি প্রকৃতির দিক থেকে, কি মানুষের দিক থেকে, অদ্ভুত ভাবে ছুটিটা উপভোগ করা গেল এবার। কলকাতায় থাকলে আমার যে আফ্রিকাদেখবার ইচ্ছে হয়, পাহাড় জঙ্গল দেখবার ইচ্ছে হয়—এখানে দীর্ঘদিন কাটালে কিন্তুআর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। গাছপালায়, নীল আকাশে, নদীর কালোজলে সাঁতার দিতে দিতে দু'পাশের বাঁশবন, সাঁইবাবলার সারি চেয়ে চেয়ে দেখা, সবুজ উলুরমাঠের দৃশ্য, পাখির অবিশ্রান্ত ডাক—এখানে মনের সব ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়। বসেলিখচি, রাণু এসে বললে—দাদা এক কাপ চা খাবেন কি? সে ওদের রান্নাঘর থেকেচা নিয়ে এসেচে বয়ে। আর কাল থেকে অনবরত বলচে—দাদা চলে যাবেন না কাল, আর একদিন থাকুন, আপনি চলে গেলে পাড়া আঁধার হয়ে যাবে।

কাল সমস্ত দিনের মধ্যে অন্তত তিন-চার বার একথা বলেছে—অথচ ওর ওপর কি অবিচার করেচি এবার—ওকে নিয়ে তাস খেলিনি একটি দিনও—ও খেলতে চাইলেও খেলিনি। ভাল করে কথাও বলিনি।

বললে—জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আসবেন তো?

আমি বললাম—যদিই বা আসি, তোর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। তুই তারআগেই তো চলে যাবি।

এদের কথা ভেবে কলকাতায় প্রথম প্রথম কষ্ট হবে।

পূজার ছুটিতে বাড়ি এসেচি। রাখামাইন্‌স গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন একামেঘান্ধকার বিকালবেলাতে সাটকিটার অরণ্যময় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিলাম। এই পথে একা যেতে ওদেশের লোকেও বড় একটা সাহস করে না—যখন একটা ছোট পাহাড়ী ঝরনায় নেমে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা অংশ সেখানে রেখে দিচ্ছি, কাল নীরদবাবুদের বিশ্বাস করাবার জন্যে, তখন সেখানে কুলুকুলুঝরনার শব্দটি মেঘশীতল বৈকালের ছায়ায় কি সুন্দর লাগছিল! পাহাড়ের saddleটা যখন পার হচ্চি, তখন ঝম্‌-ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল, হাজার হাজার বনস্পতির পাতা থেকে পাতায় ঝর্‌-ঝর্কারে বৃষ্টি পড়ছিল। দূরের কালাঝোর পাহাড় মেঘের ছায়ায় নীল হয়ে উঠেচে—ধোঁয়াধোঁয়া মেঘগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করচে। কালিদাসের 'সানুমান আম্রকুট' কথাটিবার বার মনে পড়ছিল—একা সেই মহুয়াতলায় শিলাখণ্ডে বসে।

একদিন রাখামাইন্‌স-এর বাংলোর পিছনে বনতুলসীর জঙ্গলে ভরা পাহাড়টারমাথায় অস্তগামী সূর্যের আলোতে বসেছিলাম; ওদিকে রাঙা রোদ-মাখানো সিদ্ধেশ্বরডুংরির মাথাটা দেখা যাচ্ছে, এদিকে পাহাড়ে Ledge থেকে দূরে গালুডির চারুবাবুরবাংলো দেখা যাচ্চে—সেদিন কি আনন্দ যে মনে এল—তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না।সেদিন আবার বিজয়া দশমী—নীল ঝরনার ধারে একটা শিলাখণ্ডে একা বসে রইলাম সন্ধ্যাবেলাতে, ক্রমে জ্যোৎস্না উঠল, মহুয়াতলার ঘাট দিয়ে পাহাড়ের দিকদিয়ে ঘুরে আসতে আসতে কুসুমবনীতে উড়িয়া মুদীর দোকানে গেলাম সিগারেটকিনতে। আশ্চর্যের বিষয় এইখানে হঠাৎ নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী Shanger সাহেবের

বাংলো থেকে চা খেয়ে ঐ পথে মেঘ-ঢাকা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাতেবেড়াতে বেরিয়েছিলেন—বিজয়ার কোলাকুলি সেই দোকানেই সম্পন্ন হল। ভাবলাম, আজ আমাদের দেশে বাঁওড়ের ধারে বিজয়ী দশমীর মেলা বসেচে।

তার পরদিন আমরা গালুডিতে গেলাম ডোঙাতে সুবর্ণরেখা পার হয়ে—চারুবাবুদেরবাংলোতে গিয়ে সুরেনবাবু, আমি নেকড়েডুংরি পাহাড়ে গিয়ে উঠে বসলাম। চা খেয়ে আশাদের বাড়ি গিয়ে গান শুনলাম আশার—সেখানে বিজয়ার মিষ্টিমুখ না করিয়েছাড়লেনা। ফিরবার পথে সুবর্ণরেখাতে ডোঙা পাওয়া গেল না—অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রেসুবর্ণরেখা রেলের পুল দিয়ে চন্দ্ররেখা গ্রামের মধ্যে দিয়ে অনেক রাত্রে ফিরলামরাখামাইন্‌সের বাংলোতে। নদী পার হবার সময়ে সেই ছবিটা—সেই নদীর ওপরে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখা যাচ্চে, নীচে শিলাস্তৃত সুবর্ণরেখা, পশ্চিমতীরে ঘন শাল জঙ্গল, দূরে শ্যামপুর থানার ক্ষীণ আলো, লাইনের বামদিকের গাছগুলো আধ জ্যোৎস্নায় আধ অন্ধকারে দেখা যাচ্চে না, কিন্তু ফুটন্ত ছাতিম ফুলের ঘন সুগন্ধ; বাংলোতে ফিরে এসে দেখি—প্রমোদবাবু এসে বসে আছেন।

পরদিন আমরা সবাই মিলে সাটকিটার জঙ্গলের পথে গেলাম—তার পরদিন গালুডি থেকে চারুবাবু, সুরেনবাবু ও মেয়েরা এলেন। চার নম্বর খাদানের নীচেরজঙ্গলের মধ্যে পিক্‌নিক হল। ঝুনু, আশা, আমি, চারুবাবু, সুরেনবাবু ও ভিক্টোরিয়া দত্ত বলে একটি মেয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আরোহণ করলাম। একেবারে সিদ্ধেশ্বরের মাথায়।একটা অম্লমধুর বনফলের কাঁচা ডাল ভেঙে নিয়ে পাহাড়ে উঠলাম—তৃষ্ণা নিবারণেরজন্যে।

সেদিন আমি স্টেশনের বাইরে কি একটা গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর বসে রইলাম যেমন সেদিন সকালে আমি ও প্রমোদবাবু পিয়ালতলার ছায়ায় প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে শুয়ে বটগাছটার দিকে চেয়ে প্রভাতী আলোতে অজানা কত কি পাখির গান শুনছিলাম।...

বেলা পড়ে এসেচে...বারাকপুরে বসে এইসব কথা লিখতে লিখতে মন আবার ছুটে চলে যাচ্চে সেই সব দেশে। শীতের বেলা এত তাড়াতাড়ি রোদ রাঙা হয়ে গাছের মাথায় উঠে গেল! বকুলগাছের মাথায়, বাঁশগাছের মাথায় উঠে গিয়েচে রোদ একেবারে।

সেই সুন্দর লতাপাতার গন্ধটা এবার ভরপুর পাচ্চি—ঠিক এই সময়ে ওটা পাওয়াযায়। কাল এখানে চড়কতলায় কৃষ্ণযাত্রা হল, জ্যোৎস্নারাত্রে গাছপালায় শিশির টুপটাপ ঝরে পড়চে—আমি চালতেতলার পথে একা শুধু বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। কি রূপ দেখলাম কাল জ্যোৎস্নাভরা রহস্যময়ী হেমন্ত রাত্রির! কাল নদীর ধারে বিকেলেও অনেকক্ষণ বসেছিলাম।

কাল বিকেলে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে পাটলবর্ণের মেঘস্তূপের দিকে চোখ রেখেএকটা জলার ধারে বসলাম—গাছপালার কি রূপ! সেই যে গন্ধটা এই সময় ছাড়া অন্য সময় পাওয়া যায় না—সেই গন্ধ দিন রাত সকাল সন্ধ্যা আমাকে যেন অভিভূত করেরেখেচে।

আজ ক'দিন বর্ষা পড়েচে—বসে বসে আর কোন কাজ নেই, খুকুদের সঙ্গে গল্পকরচি, কাল সারাদিনই এইভাবে কেটেচে, তবুও কাল নদীতে এপাড়ার ঘাট থেকেওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিলাম, একটু ব্যায়ামের জন্যে। আজ সকালে নদীর ঘাটেভোরবেলা গিয়ে মেঘমেদুর আকাশের শোভায় আনন্দ পেলাম। এই শিমুলগাছগুলোআমাদের এদেশের নদীচরের প্রধান সম্পদ। এগুলো আর সাঁইবাবলা না থাকলেইছামতীর তটশোভা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হত।

আজ সকালে নদীর ঘাটে গিয়ে চারিদিকের আকাশে চেয়ে চেয়ে দেখলাম মেঘ অনেকটা কেটেছে—আকাশের নীচে একটু একটু আলো দেখা যাচ্চে—বোধহয় ওবেলাআকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনটা তপ্ত নির্মল আকাশ ও

প্রচুর সূর্যালোকের জন্যেহাঁপাচ্চে—কাকাদের শিউলি গাছটার দিকে চেয়ে দেখচি গাছপালার স্বাভাবিক প্রভাতীরং ফিরে এসেচে—সে ঘষা কাচের মত রং নেই আকাশের।...কিন্তু একটু পরেই ঘন মেঘে সব ঢেকে দিলে।

আমি আবিষ্কার করেচি আমাদের দেশের প্রথম হেমন্তের সে অপূর্ব সুগন্ধটা প্রস্ফুটিত মরচে-লতার ফুলের গন্ধ। হঠাৎ কাল বিকেলে আমি এটা আবিষ্কার করেচি। কুঠিরমাঠে আজ স্নানের পূর্বে বেড়াতে গিয়ে বনে বনে খানিকটা বেড়ালাম, লক্ষ্য করে দেখলাম এই সময়ে কত কি বনের লতাপাতায় ফুল ফোটে। মরচে-লতা তো পুষ্পিতহয়েছেই, তা ছাড়া মাখমসিমের গোলাপী ফুলের দল ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে, কেঁয়োঝাঁকার লতায় ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল ফুটেচে, ফুল বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন হলদে পুষ্পরেণু,—কি ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ, ডালের গায়ে পর্যন্ত ফুল ফুটেছে।ছাতিম ফুলের এই সময়, কুঠির মাঠের জঙ্গলে একটা নবীন সপ্তপর্ণ তরুর দেখামিলল, কিন্তু ফুল হয়নি তাতে। মেটে আলু তুলবার বড় বড় গর্ত বনের মধ্যে, একজায়গায় একটা বড় কেঁয়োঝাঁকার ঝোপকে কেটে ফেলেচে দেখে আমার রাগ ও দুঃখ দুই-ই হল, নিশ্চয় যারা মেটে আলু তুলতে এসেছিল, তাদেরই এই কাজ। সজীব পুষ্পিত গাছ—কারণ এই সময় কেঁয়োঝাঁকার ফুল হয়—কেটে ফেলা যে কতদূরহৃদয়হীন বর্বরতা, তা আমাদের দেশের লোকের বুঝতে অনেকদিন যাবে। সেবার অমনি যুগল কাকাদের বাড়ির সামনের কদমগাছটা কালো বিক্রী করে ফেললে তিনটাকায়, জ্বালানি কাঠের জন্যে। এমন কি কেউ কোথাও শুনেচে? কদমগাছ, যা গ্রামের একটাসম্পদ, যে পুষ্পিত নীপ সকল বৈষ্ণব কবিকুলের আশ্রয় ও উপজীব্য—সামান্য তিনটেটাকার জন্যে সে গাছ কেউ বেচে? শুধু আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হয়, সুন্দরকে দেখবার চোখ থাকলে, ভালোবাসার প্রাণ থাকলে এ সব কি আর হত?

কাল বিকেলে অল্পক্ষণের জন্য সোনালী রাঙা রোদ উঠল—বেলেডাঙ্গার পথেযেখানে একটা বাবলা গাছের মাথায় একটা বুনো চালকুমড়ো হয়ে আছে, ঐখানটাতেবসলুম—কত দিনের মেঘমেদুর আকাশের পরে আজ রোদ উঠেচে, এ যেন পরমপ্রার্থিত ধন!

এক জায়গায় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকতে দেখলাম মাঠের মধ্যে। কার্তিক মাসেসোঁদালি ফুল, কল্পনা করতেই পারা যায় না। কেলেকোঁড়ার ফুলও এসময়ে হয়।

কাল মেয়েরা চোদ্দ শাক তুললে, চোদ্দ পিদিম দিলে—খুকুদের বোধনতলায় বড়একটা প্রদীপ দিয়েছিল, বিলবিলের ধারে, উঠোনের শিউলিতলায়। বারাকপুরে চোদ্দপিদিম দেওয়া দেখিনি কতকাল!

আজ বিকেলে খুকুদের কুঠির মাঠে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। পুরনো কুঠির হাউজঘরেঘোর জঙ্গল হয়ে গিয়েচে—কত কি বনের লতা হয়ে আছে—খুকুর তা দেখে আনন্দ উৎসাহ দেখে কে! একটা লতার মধ্যে কি ভাবে ঢুকে সে খানিকটা দুললে, মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করলে—আমায় কেবল চেঁচিয়ে বলে—দাদা, এটা দেখুন, ওটা দেখুন। তারপরফিরে এসে ছেলেদের নিয়ে গোপালনগরে গেলাম কালী পুজোর ঠাকুর দেখাতে।হাজারীর ওখানে অনেক রাত হয়ে গেল তাস খেলতে বসে—অনেক রাত্রে বাড়িফিরি।

পরদিনও আবার কুঠির মাঠে যাওয়ার কথা ছিল—ওরা সবাই গেল, কিন্তু মনোরমারভাই কালো কুঠির জঙ্গলে হাঁটুটা বেজায় কেটে ফেললে, তার ফলে সকলেরই বেড়ানোবন্ধ হল। রাত্রে খুকুকে অনেক গল্প শোনালাম অনেক রাত পর্যন্ত।

আজ সকালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। রায়বাড়ির পাঁচি কাঁদচে, ওর দাদা আশু মাসখানেক হলমারা গিয়েচে, সেই জন্যে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের ধরনে ‘ও ভাই রে, বাড়ি এসো’, বলেচেঁচিয়ে কাঁদচে। কিন্তু আমার মনে সত্যিই দুঃখ হল ওর জন্যে। পাঁচিকে এ গাঁয়ের সব লোকেই ‘দূর ছাই’ করে, সবাই ঘেন্না করে—আজ পাঁচি ওদের সবারই বড়

হয়েগিয়েচে। তবুও তার প্রতি সহানুভূতি নেই কারুর—কান্না শুনে পিসিমা বলচেন, মুখ বেঁকিয়ে—আহা! মনে পড়েচে বুঝি ভাইকে!

নৌকা করে বনগাঁয়ে যাচ্ছি সকালবেলা। চাল্‌কীর ঘাটে এসেচি—এবার এদিকের গড় ভেঙেচে। কেমন নীল রং-এর একটা পাখি বাবলা গাছে বসে শিস্ দিচ্চে। নৌকোর দুলুনিতে লেখার বড় ব্যাঘাত হচ্চে। নীল কলমীর ফুল, হলদে বড় বড় বন ধুঁধুলেরফুল ফুটেচে। আর এক রকম কি লতায় কুচো কুচো হলদে ফুল ফুটে চালতেপোতারবাঁকে ঝোপের মাঝে আলো করে রেখেচে—সে যে কি অপূর্ব সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনাকরা যায় না! এই ফুলের নাম জানি নে, যেন হলদে নক্ষত্র ফুটে আছে— ছোট ছোটক্ষুদে ক্ষুদে, যেন নববধূর নাকছাবি। কার্তিকের শেষে এই ফুলটা ফোটে জেনে রাখলাম, আবার আসচে বছর দেখতে আসবো। এতদিন এ ফুল আমার চোখে পড়েনি। হেমন্তেএত বনের ফুলও ফোটে এদেশে। ঝোপের মাথা আলো করে সবুজ পাতালতার মধ্যেতিৎপল্লার ফুল, ক্ষুদে ক্ষুদে ঐ অজানা ফুল, মাঝে মাঝে বড় বড় বনকলমীর ফুল—কি রূপ ফুটেচে প্রভাতের! কাশফুল তো আছেই মাঝে মাঝে, নদী তীরের কি অপূর্বশোভা এখন—তা ছাড়া পুষ্পিত সপ্তপর্ণও মাঝে মাঝে যথেষ্ট।

ঐ অজানা ফুলটা মাঝিকে দিয়ে ঝোপ থেকে পাড়িয়ে আনলাম—দশটি করে ছোট ছোট পাপড়ি—ছ'টা করে পরাগ কোষ বা গর্ভকেশর প্রত্যেকটাতে। জলে কচুরীপানার ফুল ফুটেচে, অনেকটা কাঞ্চন ফুলের রং কিন্তু দেখতে বড় চমৎকার—একটা লম্বাসরস সবুজ ডাঁটায় থোকা থোকা অনেকগুলো ফুল—ঐ সুন্দর ফুলের জন্যেই কচুরীপানাসৃষ্টির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে—ভগবানের কাছে সুন্দরের সার্থকতা অমর—তার utility-টা গৌণ। মাঝি গল্প করছিল, এবার অনেকে ইছামতীতে মুক্তা পেয়েছে ঝিনুকতুলে। এ সময়ে বন্যেবুড়ো গাছেও শাল মঞ্জরীর মত দেখতে সবুজ রং-এর ফুল ফুটেচে—আর এক প্রকার জলজ ঘাসের নীল ফুল ফুটেচে—এর রং ঠিক তিসির ফুলের মত নীল। এক একটা ছোট গাছের মাথায় ছোট ঝোপে ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে অজানাফুল ফুটে আলো করচে।

কাল রাত্রে কি একটা কথা মনে এল—তার শব্দ-পরম্পরায় মনে একটা অপূর্ব অননুভূত ভাবের উদয় হল। শব্দেরও ক্ষমতা আছে। প্রমথবাবু বলেন, নেই। এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন তর্ক করেছিলাম।

আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ একেবারে নির্মেঘ, নির্মল। দুঃখ হল এই ভেবেযে আমিও বারাকপুর থেকে এলাম আকাশও গেল পরিষ্কার হয়ে! আজ এই জন্যে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—বারাকপুরে এমন নীল আকাশটা দেখতে পেলাম না! খুকুর গাওয়া সেদিনকার গানটা বার বার মনে আসতে লাগল—

মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর।

নমোনমঃ, নমোনমঃ, নমোনমঃ।।

কাল কলকাতা থেকে এসেছি, বেশ ভাল লাগল আজ সকালে খয়রামারির মাঠ ও বন। বনে সাদা সাদা সেই কুচো ফুল—শীতকালে অজস্র ফোটে এদেশের বনে জঙ্গলে—নদীয়া ও যশোর জেলার সর্বত্র দেখেছি এ সময়ে। কলেজে পড়বার সময়যখন প্রথম প্রথম মামার বাড়ি যেতাম—তখন ভবানীপুরের মাঠের ওদিকের পথ দিয়ে যাবার সময় দেখতাম একটা বড়ঝোপে ঐ ফুলটা ফুটে থাকত। কেলো এসেছিলআমার সঙ্গে আমার বাসায়—এক সঙ্গে বাক্স, বিছানা বেঁধে বাসা থেকে রওনা হলাম। অনেকদিন পরে ওকে দেখে মনে বড় আনন্দ পেয়েছি কাল।

বড়দিনের ছুটিতে অনেককাল বারাকপুরে আসিনি—এবার এলাম। শীতের পল্লীপ্রান্তের কি শোভা, তা এতদিন ভুলে ছিলাম। বিকেলে আজ যখন বেলেডাঙ্গাবেড়াতে গেলাম—বনের কোলে সর্বত্র ফুটন্ত ধুর ফুলের প্রাচুর্য ও শোভা দেখে মনেহোল, সেদিন মণি বোসের আড্ডায় যারা বলছিল যে, বাংলাদেশের বনে ফুল তেমননেই, তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কতটুকু জানে? ক্রোকাস, মার্গারেট কি কর্ণফ্লাওয়ার এখানে ফোটে না বটে—কিন্তু যে দিকে চোখ তাকাই, সে দিকেই এই যে প্রস্ফুট নীলাভশুভ্রবর্ণের ধুর ফুলের অপূর্ব সমাবেশ—এর সৌন্দর্য কম কিসে? কি প্রাচুর্য এই ফুলের—ঝোপের নীচেও যে ফুল—সেখান থেকে থাকে থাকে উঠেচে ঝোপের মাথা পর্যন্ত, আগাগোড়া ভর্তি। এত

নীচু ও অত উঁচুতে ও ফুল কি করে গেল তাই ভাবি। ঋতুতেঋতুতে কত কি ফুল ফোটে আমাদের দেশের বনে ঝোপে, আমার দুঃখ হয় এরসন্ধানও কেউ রাখে না, নাম পর্যন্ত জানে না। অথচ সুন্দরকে যারা ভালবাসে—তারাবাংলার নিভৃত মাঠ বনঝোপের এই অনাদৃত অথচ এই অপূর্ব সুন্দর ফুলকে কখনো ভুলবে না।

বেলেডাঙ্গায় গিয়ে সেকরার দোকানে বসে গল্প করলাম। ছোট্ট খড়ের ঘরে দোকান।বাঁশের বেড়া। ননী সেকরার মেজছেলে বিড়ি বাঁধ্‌চে—তার দোকান ঘরের সামনেএকটা নতুন কামার দোকান হয়েচে—সেখানে হাল পোড়াচ্ছে। হালের চারধারে ঘুঁটের সনসনে আগুনে অনেক লোক বসে আগুন পোয়াচ্চে। দোকানের পিছনের বেড়ায়ধুরফুল ফুটে আছে। যেদিকে চাই সে দিকেই এই ফুল—এক জায়গায় মাঠের মধ্যে থাকে থাকে কতদূর পর্যন্ত উঠেচে এই ফুলের ঝাড়। রাঙা রোদ ও রাঙা সূর্যাস্তশীতকালের নিজস্ব। এমন অস্ত আকাশের শোভা অন্য সময় দেখা যায় না।

যুগল বোষ্টমের সঙ্গে দেখা ফিরবার পথে—সে বল্লে তার চলচে না, আমি তার G. T. পড়বার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিনা।

কাল আবার ক্যাম্প টুলটা নিয়ে কুঠির মাঠের নিভৃত বনঝোপের ধারে গিয়েবসলুম। ধুরফুল কি অপূর্ব শোভাতেই ফুটেচে। পাখি এত ভালবাসি কিন্তু কাক ছাড়া কলকাতাতে আর কোনো পাখি নেই—এখানে কত কি অজস্র পাখির কলকাকলি, গাছপালা বন ঝোপের কি সীমারেখা, যেন নৃত্যশীল নটরাজ, ওপারের কাশচরে শিমুল গাছটাদেখা যাচ্চে, নীলাকাশে রৌদ্র ঝলমল করচে। একটা বাবলাগাছের ফাঁক দিয়ে চাইলে কোন অজানা দেশের কথা মনে আনে— শীতের অপরাহ্নে বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে যে কি সৌন্দর্য ভরে থাকে, চোখে না দেখলে সে বোধহয় নিজেই বিশ্বাস করতুম না। আর দেখলাম এক জায়গায় বসে থাকলে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। ভাল করেসে জায়গায় রস অনেক বেশি পাওয়া যায়—কোথায় লাগে গালুডি, কোথায় লাগেকাশ্মীর, কোথায় লাগে ইটালি—আমার মনে কতটুকু আনন্দ ও চিন্তা সে জাগাতে পারে এই যদি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষের পরিমাপক হয়—তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতেপারি ইছামতী তীরের এই নিভৃত বনঝোপ, ধুরফুল-ফোটা মাঠের, রাঙা রোদমাখাশিমুলগাছের, বনপাখির এই কলকাকলির অপরূপ সৌন্দর্যের তুলনা নেই। যে পরিদৃশ্যমান আকাশের এক-তৃতীয়াংশে দেড়লক্ষ Super Galaxy আছে এখানে বসে বসে ভেবে দেখলুম—সে সব বড় বিশ্বের মধ্যে কি আছে না আছে জানিনে—তবে এখানে যা আছে, সেখানেও তাই আছে বলে মনে হয়। What is in microcosm is also in macrocosm—সে সব দার্শনিক আলোচনা এখন থাকুক, বর্তমানে এই সুবৃহৎ বিশ্বের এককোণে ধুরফুল-ফোটা বনঝোপের পাশে ক্যাম্পটুলটা পেতে বসে একটু আনন্দপাচ্চি পাই।

অনেক বেলা গেলে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলাম। একটু আগে যেতাম, খুকু বসেছিল, বল্লে, একটু দেরি করুন, আরও বেলা যাক্। খুব জোর পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেলামবেলেডাঙ্গার সেক্‌রার দোকানে—মধ্যে এই ধুরফুল-ফোটা বিশাল মাঠটা যেন একদৌড়ে পার হয়ে গেলাম, তারপর ননী সেক্‌রার কত গল্প শুনলাম বসে বসে। তার ন'টাগরু ছিল, আর বছর ফাগুন মাসে একে একে সব ক'টা মরে গেল গাল-গলা ফুলে।দোকানের সামনে একজন লোক বসে হাল পোড়াচ্চে আর অত্যন্ত খেলো ও বাজে সিগারেট টানচে। আমি বল্লাম, ও খেয়ো না, ওতে শরীর খারাপ হয়। বল্লে, আমি খাইনে বাবু, এক পয়সায় সে দিন হাটে কিনলাম ছ'টা—তাই এক একটা খাচ্চি।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েছে—কুঠির মাঠে সুঁড়ি জঙ্গলের পথটা অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, পথ দেখা যায় না। নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম আমাদের ঘাটে—ওপারে একটা নক্ষত্র উঠেচে—সেটার দিকে চেয়ে কত কথা যে মনে পড়ল! ঐ Super galaxy-দের কথা—বিরাট space ও নীহারিকাদের কথা—এই বনফুল ও পাখিদের কথা। কতক্ষণসেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—এই নক্ষত্রটার সঙ্গে যেন আমার কোন অদৃশ্যযোগসূত্র রয়েচে—বসে বসে এই শীতের সন্ধ্যায় এই ইছামতীতে কত কি ঘটেছিলপুরোনো দিনে, সে কথা মনে এলো।

গৌরীর কথা মনে এলো—তারপর অন্ধকার খুব ঘন হয়ে এলো। আমি ধীরে ধীরে উঠে বাঁশবনের পথ দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আজ দুপুরে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে আমার সেই পুরোনো জায়গায় বসলাম—সেই যেখান থেকে কুঠির দেবদারুগাছটা দেখা যায়—কি অপরূপ শোভা যে হয়েচে সেখানে ফুটন্ত ধুরফুলের, তা নাদেখলে শুধু লিখে বোঝানো যাবে না। এই যে আমি লিখচি, আমারই মনে থাকবে নাঅনেকদিন পরে,—ওই ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে যাবে মনের মধ্যে। এরকম হয় আমিজানি—তবুও আজই দেখেচি, তাই নবীন অনুভূতির স্পর্ধায় জোর করে বলছি বনফুলের শোভার এ প্রাচুর্য আমি দেখিনি। বিহারে নেই, সিংভূমে নেই, নাগপুরে নেই—এইবাংলাদেশের sub-tropical বন জঙ্গল ছাড়া গাছপালার এই ভঙ্গি ও ফুলের এইপ্রাচুর্য কোথাও সম্ভব নয়। কেন যে লোকে ছুটে যায় বম্বে, দিল্লী, কাশী, দেওঘর তা বলাকঠিন! বাংলাদেশের এই নিভৃত পল্লী-প্রান্তের সৌন্দর্য তারা কখনো দেখেনি—তাই।

আজ বিকেলে টুনি, কাতু, জগা, বুধো এদের সঙ্গে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়েবনঝোপের ধারে টুলটা পেতে বসলাম। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে গেল—একটা ফুল-ফোটা ঝোপের ধারে কতক্ষণ বসে রইলাম। তারপর একটা নরম কচি ঘাসে-ভরা জলারধারে মুক্ত সান্ধ্য হাওয়ায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করলুম কতক্ষণ—আমিএই সবই ভালবাসি, সাধে কি কলকাতা বিষ লাগে! এই শীতকালের সন্ধ্যায় এতক্ষণ ধোঁয়ায় সারা কলকাতা শহর ভরে গিয়েচে—আর এখানে কত ডাহুক, জলপিপি, দোয়েল, শালিকের আনন্দ কাকলি, কত ফুটন্ত বনফুলের মেলা, কি নির্মল শীতেরসন্ধ্যার বাতাস, কি রঙীন্, অস্তদিগন্তের রূপ, শিরীষ গাছে কাঁচা সুঁটি ঝুল্‌চে, তিত্তিরাজ গাছে কাঁচা ফলের থোলো দুলচে, জলার ধারে ধারে নীল কলমী ফুল ফুটেচে। মটরশাক, কচি খেঁসারি শাকের শ্যামল সৌন্দর্য—এই আকাশ, এই মাঠ, এই সন্ধ্যায়-ওঠাপ্রথম তারাটি—জীবনে এরা আমার প্রিয়, এদেরই ভালবাসি, এরাই আবাল্য আমারঅতি পরিচিত সাথী—এদের হারিয়ে ফেলেই তো যত কষ্ট পাই!

বিকেলে আজবেলেডাঙার মরাগাঙের আগাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় একবোঝা পাকাটির ওপর গিয়ে বসে ওবেলার সেই কথাটা চিন্তা করছিলাম—ভগবান তারপুজো না পেলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন না—ওঁর পুজোর সঙ্গে ভয়ের কোনসম্পর্ক নেই—তাঁর যে পুজো, সে শুধু প্রেমের ও ভক্তির, এই পাড়াগাঁয়ে এদের সেকথাবোঝানো শক্ত। পুজোর ঘরে বসে আজ ওবেলা যখন শালগ্রাম পুজো করছিলাম, তখনই আমার মনে হল, এই ঘরের বদ্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভগবান নেই, তাকে আজ বিকেলে খুঁজবো সুন্দরপুরের কিংবা নতিডাঙ্গার বাঁওড়ের ধারে মাঠে, নীল আকাশের তলায়, অস্ত-বেলার পাখিদের কলকাকলির মধ্যে। তাই ওখানে গিয়েবসেছিলাম।

বসে বসে কিন্তু আজমাবাদের কথা মনে এলো। এইপৌষ মাসে ঠিক এই সময়েআমি সেখানে যেতুম, ঠিক এই বিকেলে রাঙা রোদের আভা মাখানো তিন টাঙার বনেরভেতর দিয়ে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপারে যেতুম ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে—কলাইক্ষেতথেকে কলাইয়ের বোঝা মাথায় মেয়েরা আসতো, গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকা চলে যেত মুঙ্গেরের দিকে, ভীমদাস টোলায় আগুনের চারিধারে মাঠ কুয়াশায়ভরে গিয়েচে—সেই ছবিগুলো মনে হলো। তার চেয়ে যে আমাদের দেশের ভূমিশ্রী, এই নির্জন শান্তিতে ভরা অপরূপ সুন্দর পল্লীপ্রান্ত, ওই মরাগাঙের শুকনো আগাড়েরনতুন কচি ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্চে যে গরুর দল, ওই দূরের বটগাছটা, মাঠেরওপারের বনফুল ফোটা বনঝোপ, এই ডাহুক পাখির ডাক, গ্রামসীমায় বাঁশবন—এসব যে রূপের বিত্তে নিঃস্ব তা নয়, বরং আমার মনে হয় এরা বিহারের সেই বৃক্ষলতা-বিরল প্রান্তরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধির, কিন্তু সেখানে একটা জিনিস ছিল, যা বাংলাদেশেরএ অঞ্চলে অন্তত নেই—Space! wide open Space! দূরবিসর্পী দিগ্বলয়, দূরত্বেরঅনুভূতি, একটা অদ্ভুত মুক্তির আনন্দ—এ যেমন পেয়েছিলাম ইসমাইলপুরের দিয়ারাতে ও আজমাবাদে—আর কোথাও তা মিলবে না।

আজ খুকু দুপুরে খানিকটা বসে রইল—আমি মাঠে বেড়াতে যাবো বলে গোপালনগরেগেলাম না। মরগাঙের আগাড়ে আজও অনেকক্ষণ গিয়ে বসেছিলাম। বেলেডাঙ্গারপুলের কাছে ফিরবার পথে কি একটা বনফুলের সুগন্ধ বেরুল—খুঁজে বার করে দেখি কাঁটাওয়ালা একটা লতার ফুল। লতাটা আমি চিনি, নাম জানিনে। ননী সেক্‌রার দোকানের কাছেই ঝোপটা। ননী কাদা দিয়ে রূপো গালাবার মুচি গড়চে। ওদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার পরে নদীর ধারে এসে খানিকটা দাঁড়ালাম—ওপারে কালপুরুষ উঠেচে, নীল Rigel-এর আলো নদীর জলে পড়েছে। নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়েওপারের তারাটার দিকে চেয়ে থাকবার যে আনন্দ, যে অনুভূতি, তার বর্ণনা দেওয়া যায়না—কারণ অনুভূতির স্বরূপ তাতে বর্ণিত হয় না অথচ কতকগুলো অর্থহীন কথা দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে অনুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়। এ অব্যক্ত, অবর্ণনীয়।

আজ এই সন্ধ্যাতেই একটা উল্কাপাত দেখলাম—ওপাড়ার ঘাটের মাঝামাঝি আকাশে—প্রথমে দেখা, তারপর নীল ও বেগুনি রং হয়ে গেল জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে— জলে ছায়া পড়ল। আমি অমন ধরনের উল্কাপাত দেখিনি!

আজ এখানে বেশ শীত পড়েচে। দুপুরের আগে ফুল-ফোটা মাঠে বেড়াতে যাওয়া আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। আজ আকাশ কি অদ্ভুত ধরনের নীল! কুঠির সেই দেবদারুগাছটা, কানাই ডোঙার গাছ, শিরীষ, তিত্তিরাজ কি সুন্দর যে দেখাচ্চে নীল আকাশেরপটভূমিতে! মাঝে মাঝে দু'একটা চিল উড়চে বহুদূরের নীল আকাশের পথে! এসব ছবি মনে করে রাখবার জিনিস। কি আনন্দ দেয়, কত অননুভূত ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত করে এরা। প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্জন স্থানে প্রকৃতির এই রূপমনে নতুন ধরনের অনুভূতি ও চিন্তা এনে দেয়। এ আমি জীবনে কতবার দেখলাম—তার প্রমাণ পাই প্রতি সন্ধ্যায় আজকাল কুঠির মাঠ থেকে ফিরবার পথে, নিভৃত সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের চরের আকাশে প্রথম-ওঠা দু'চারটা নক্ষত্রের দিকেযখন চেয়ে থাকি তখনই বুঝতে পারি। যে দেবলোকের সংবাদ তখন আমার মনেরনিভৃত করে ঐ রিগেল্ বা অন্য অজানা নক্ষত্র বহন করে আনে সে গহন গভীর উদাত্তবাণী অমৃতের মত মনকে বৈচিত্র্যময় করে, সাধারণ পৃথিবীর কত ঊর্ধ্বলোকের আয়তনেমনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় একমুহূর্তে। এ একটা বড় সত্য। বড় বড় সাধক, কবি, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রকর, শিল্পী—যাদের চিন্তা আর ভাব নিয়ে কারবার, এ সত্যটাতাদের অজ্ঞাত নয়। এজন্যেই এমার্সন বলেচেন, "Every literary man should embrace Solitude as a bride." এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল গত জুলাই মাসের Adelphi কাগজে বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। নির্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকালোক। জার্মান মিস্টিক্ এক্‌হার্ট কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না— তাঁর "Our Heart's Brotherhood" গাথাগুলির মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে এ কথার।

ওকথা যাক্। আমি নিজের একটা ভুল আবিষ্কার করেচি, যাকে এতদিন বলেএসেচি ধুরফুল, তার আসল নাম হোল এড়াঞ্চির ফুল। ধুরফুল লতার ফুল বিলবিলেতে ছিল, সাদা বড় বড় ফুল ফুটত—পুঁটি দিদি বলছিল। আজকাল আর দেখা যায় না। শ্যামলতা, ভোমরালতার ফুলও এসময় ফোটে। আগে নাকি আমাদের পাড়ার ঘাটে শ্যামলতার ফুল ফুটে বৈকালের বাতাসকে মধুর অলস গন্ধে ভরিয়ে দিত—আজকালসে লতাও নেই, সে ফুলও নেই।

কাল সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কুঠির মাঠে বেড়াতে বেড়াতে রঙীন অস্ত-আকাশের দিকে চেয়ে অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে কত বিচিত্র ধরনের গাছপালার সীমারেখা দেখলাম—এদের এখানে যা রূপ, তা এক যদি ভারতবর্ষের মধ্যে মালাবার উপকূলে এবং আসাম ও হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের অধিত্যকায়থাকে— আর কোথাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

ছোট এড়াঞ্চির ফুল সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েচে। কাল যখন মাঠের মধ্যে দিয়েবেলেডাঙ্গায় গোয়ালপাড়ায় গেলাম—উঁচুনিচু মাটি ও ডাঙা পাশে রেখে, ফুল-ফোটা বড় বড় ঝোপের নীচে দিয়ে—কত কি পাখি বেড়াচ্চে

ঝোপের নীচে শুকনো পাতাররাশির ওপরে। কাঁটাওয়ালা সেই সবুজ লতাটায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে—খুকুবল্লে, বনতারা।—নামটি ভারি সুন্দর, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা গেল না ও কোন্ লতার কথাবলচে—আর চারিদিকে অজস্রসম্ভারে ঢেলে দেওয়া ছোট এড়াঞ্চির ফুল। বনে, ঝোপেবাব্‌লাগাছের মাথায়, ফুলগাছের ডালে, বেড়ার গায়, ডাঙাতে যে দিকেই চাই সেই দিকে ওই সাদা ফুলের রাশি। আমি বাংলায়ও বনের এমন রূপ আর কখনো দেখিনি।যদি জ্যোৎস্না রাত্রে এই রূপ দেখতে পেতাম!

এ ক'দিন ছিলাম কলকাতায়। ওরিয়েন্টাল সোসাইটির প্রদর্শনীতে এবার নন্দলালবসুর দু'খানি বড় সুন্দর ছবি দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। খুকু ও জাহ্নবীর মেয়ে খুকীসঙ্গে ছিল—তারাও দেখেছে, তবে নন্দবাবুর ছবির তারা কি বুঝবে? ওদের দেখালুম বায়োস্কোপ, জু, সার্কাস্—আর এখানে ওখানে নিয়ে বেড়ালুম। একদিন সজনীদাসেরবাড়ি, একদিন নীরদের বাড়ি, একদিন নীরদ দাসগুপ্তের ওখানে। দুঃখ হল যে এখানেএসময়ে সুপ্রভা নেই।

কাল নৌকায় বনগাঁ থেকে এলাম। কি অদ্ভুত রূপ দেখলাম সন্ধ্যায় নদীর। শীতও খুব, অন্ধকার হয়ে গেল। কলকাতার হৈ চৈ-এর পরে এই শান্ত সন্ধ্যা, ফুল-ফোটা বন, মাঠ, কালো নিথর নদীজল মনের সমস্ত সংকীর্ণ অবসাদ দূর করে দিয়েচে। চালতেপোতর বাঁকে বনের মাথায় প্রথম একটি তারা উঠেচে— কতদূর দেশের সংবাদ আলোরপাখায় বহন করে আনচে আমাদের এই ক্ষুদ্র, গ্রাম্য নদীর চরে—আমার মনের নিভৃতকোণে।

ঘাটে যখন নামলুম, তখন খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। খুকু ও আমি জিনিসপত্রনিয়ে বাঁশবনের অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে বাড়ি এলুম, খুকু তো একবার ভয়ে চিৎকার করেউঠল কি দেখে। ভয়ের কারণ এই যে, এসময়ে আমাদের দেশে বাঘের ভয় হয়।

দুপুরে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে কুঠির এদিকের বনের মধ্যে সেই যে ঢিবিটাআছে, সেখানে খানিকটা বসলুম—তারই পরে একটা নাবাল জমি, আর ওপারে সেইবটগাছটা। আকাশ কি অদ্ভুত নীল! ছোট এড়াঞ্চির ফুল এখনও ঠিক সেই রকমইআছে—কদিন আগে যা দেখে গিয়েচি, সে সৌন্দর্য এখনও ম্লান হয়নি। প্রায় পনেরো দিন ধরে এর সৌন্দর্য সমান ভাবে রয়েচে, এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি এ বড় আশ্চর্যের কথা। এমন কোনো বনের ফুলের কথা আমার জানা নেই, যা ফুটন্ত অবস্থায় এতদিন থাকে।বালজ্যাকের গল্পটা (Atheists Mass) তখনই পড়ে সবে বেড়াতে গিয়েচি, আকাশযেন আরও নীল দেখাচ্ছিল, বনফুল-ফোটা ঝোপ আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। নাইতেগিয়ে বাঁশতলার ঘাট পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে এলাম।

বিকেলে ক্যাম্প-টুলটা নিয়ে গিয়ে কুঠির সেই ঢিবিটাতেই অনেকক্ষণ বসে রইলুম—রোদ রাঙা হয়ে গেল ওপারের। শিমুলগাছটার মাথার ওপর উঠে গেল, তখনও আমিচুপ করে বসেই আছি। (কি ভয়ানক শীত পড়েচে এবার, সেই যে লিখচি আঙুল যেনঅবশ হয়ে আসছে।) আমার সামনে পেছনে ফুল-ফোটা সেই ঝোপ বন, পাশেই নদী। একবার ভাবলুম বেলেডাঙ্গায় যাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে পারা গেল না এইসৌন্দর্যভূমি ছেড়ে।

নির্জন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মত নদীতীরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর পায়ের দ্যুতিলোকেরদিকে চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ওপারের চরের ওপরে উঠেচে কালপুরুষ, তারপর এখানে ওখানে ছড়ানো দু'চার দশটা তারা। এই নিভৃত সন্ধ্যার আনন্দ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক—আমি দেখচি কুঠির মাঠের যে আনন্দ তার প্রকৃতি Aesthetic. কিন্তু এইজনহীন নদীতীরে কুঁচঝোপ, বাঁশবন, ওপারের খড়ের মাঠ, এদের সবার ওপরকার ওই দ্যুতিলোক যে বাণী প্রাণে এনে পৌঁছে দেয়, তা বিশ্বলোকের এবং অন্তরলোকের যিনি অদৃশ্য অধিদেবতা, তাঁর বাণী—আজকাল যেন তার প্রকৃতি একটু একটু বুঝতে পারি।আর আসলে বুঝতে ওইটুকু পারি বলেই তো তা আমার কাছে বাণী এবং পরম সত্য, নইলে তো মিথ্যে হোত। যা ধরতে পারিনে, বুঝতে পারিনে, আমার কাছে তা ব্যর্থ।

কাল দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে অনেকগুলি ভাল ভাল ফরাসী গল্প পড়লাম।তারপর স্নানের পূর্বে কুঠির মাঠে বেড়িয়ে এলাম। যে জায়গাটাতে অনেকদিন যাইনি—সেই চারিদিক বনে ঘেরা ধুরফুল-ফোটা ঝোপের বেড়া দেওয়া মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। শীতের দুপুরে নীল আকাশের রূপ, আর সূর্যাস্তের রূপ—এদের অন্য কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। শীতকালে ইসমাইলপুর আর আজমাবাদের দিগন্তব্যাপী মাঠেরপ্রান্তে রাঙা সূর্যাস্ত দেখে ভাবতাম এ বুঝি বিহারের চরের নিজস্ব সম্পত্তি—কিন্তু এবার দেখলাম বাংলাদেশেও অমনি রক্তাভ অস্তদিগন্ত স্বমহিমায় প্রকাশ পায়। আজ বিকালেও সূর্যাস্তের শোভা দেখবার জন্যে কুঠির মাঠে গিয়ে এক জায়গায় ক'টা রোদ-পোড়াঘাসের ওপর গায়ের আলোয়ানখানা বিছিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ডাইনে একটা বাব্‌লাগাছের শুকনো মগডালে অনেক পাখি এসে বসে যেন নামজাদা চীনে চিত্রকরের একটা ছবি তৈরি করেচে। সামনের বনঝোপ, কুঠির শিরীষ গাছে রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, নীল আকাশের কি রূপ! বারাকপুরে আর হয়তো কখনো আসবো না—কুঠির মাঠ আর দেখবো কি না কি জানি? আজকার এই অপরাহ্ণ যেন চিরদিন মনে থাকে— এর সুখ, আনন্দ ও এর দুঃখ। মাঠ থেকে উঠে গেলাম গঙ্গাচরণের দোকানে—সেখানে সবাই বসে দেশবিদেশের গল্প করচে। অশ্বিনী যাত্রা-দলের বাজিয়ে, এখানেই ঘর বেঁধে বাস করে। তার বাড়ি পূর্ণ গোঁসাই বলে একটা লোক এসেছিল—সে এখানে এসে গল্পকরে গিয়েছে যে, সে বিলাত ঘুরে এসেচে। প্রমাণস্বরূপ বলেচে কোথায় নাকি প্রকাণ্ড পিতলের মূর্তি সে দেখেচে—এ দ্বীপে একখানা পা, আর একটা দ্বীপে আর একখানা পাতার তলা দিয়ে সে জাহাজে ক'রে গিয়েচে। এ একটা অকাট্য প্রমাণ অবিশ্যি যে, সে লোকটা বিলেতে গিয়েছিল!

আজই যাবার কথা ছিল কিন্তু খুকু বল্লে আজ থাকুন। গত শনিবারে খুকুদের বাড়িবারাকপুরে গিয়েছিলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল পৈঠেতে আসার সময়। সকালে গোঁসাইবাড়ির পাঠশালা Examine করতে গেলাম। বোষ্টম বুড়ির বাড়ির সামনে বড় বটগাছের তলায় যুগল বসে কথা বলচে একজন বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে। বৃদ্ধ বলচে, 'আমাদেরদিন পার হয়ে গিয়েচে, বেলা চারটে, এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পথ দেখাও, পথদেখাও।' কথাটা আমার বড় ভাল লাগল। দুপুরে আটির ধারে মাঠে যেমন রোজবেড়াতে যাই, আজও গেলাম। দুপুরের আকাশ যেমন নীল, অপরূপ নীল—এমন কিন্তুঅন্য কোনো সময়ে পাইনি। দুপুরের পরে খুকু এসে অনেকক্ষণ ছিল। তাই দুপুরে কিছু লেখা হয়ে উঠল না। বিকেলে আমি গিয়ে কুঠির মাঠে একটা নিভৃত স্থানে গায়ের আলোয়ানখানা ঘাসের ওপর বিছিয়ে তার ওপর চুপ করে বসে রইলাম। এতে যেআমি কি আনন্দ পাই। একটা অনুভূতি হল আজ, ঠিক সেই সময় রাঙা রোদ ভরা আকাশের নীচের গাছপালায় আঁকা-বাঁকা শীর্ষদেশ লক্ষ্য করতে করতে।

সকালে উঠে নৌকাতে আবার বনগাঁয়ে যাচ্ছি। জলের ধারে ধারে মাছরাঙা পাখিবসে আছে নলবনে। কাঁটাকুমুরে লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরচে। তবে ফুলেরশোভা নেই, গন্ধই যা আছে।

বড়দিনের ছুটি শেষ হোল। আবার কল্‌কাতায় ফিরতে হবে। কে জানে, কবেআবার দেশে ফিরতে পারব!